স্বস্তিকা

৬৫ বর্ষ, ২৫ সংখ্যা।। ১১ ফেব্রুয়ারি - ২০১৩।। ২৮ মাঘ - ১৪১৯ ।। দাম : সাত টাকা

উজ্জয়িনীতে ঐতিহাসিক জনজাতি সমাবেশ

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় ▯ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন ▯ ৬-৮

উন্নয়ন নয়, নিজস্ব 'আইডেনটিটি'র জন্যই গোর্খাল্যান্ডের দাবি ▯ ৯

খোলা চিঠি : বুদ্ধবাবুকে প্রশ্ন করে বিরক্ত করবেন না প্লিজ ▯ সুন্দর মৌলিক ▯ ১১

ইতিহাস যেন মিথ্যার বেসাতি না হয় ▯ দীনেশচন্দ্র সিংহ ▯ ১২

কল্যাণ আশ্রমের কার্যকর্তাদের 'জনজাতি সমাগম' : উজ্জয়িনীতে ঐতিহাসিক 'বনবাসী কুম্ভ' ▯ অরুণ ভট্টাচার্য ▯ ১৪

হরিনাম সংকীর্তনের ইতিহাস ▯ রবীন সেনগুপ্ত ▯ ২১

ভগবতী ভারতী ▯ নবকুমার ভট্টাচার্য ▯ ২২

পৌরাণিক নগর প্রয়াগ ▯ গোপাল চক্রবর্তী ▯ ২৩

ভাইব্রান্ট গুজরাট : স্বপ্নিল জীবনের সন্ধানে ▯ স্বপন দাশগুপ্ত ▯ ২৮

শিক্ষার মানের অবনমন : দায়ী রাজনৈতিক নেতৃত্ব ▯ তারক সাহা ▯ ৩০

সংস্কার ভারতীর শিশু-কিশোর নাট্যমেলা ▯ বিকাশ ভট্টাচার্য ▯ ৩৯

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

বনবাসী কুম্ভ - পৃঃ ১৪-১৮

নিয়মিত বিভাগ

চিঠিপত্র : ১৯ ▯ ▯ ভাবনা-চিন্তা : ২০ ▯ ▯ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ ▯ ▯ অঙ্গনা : ২৬ ▯ উত্তরবঙ্গ : ৩২ ▯ ▯ অন্যরকম : ৩৩ ▯ ▯ সমাবেশ-সমাচার : ৩৫-৩৭ ▯ ▯ পুস্তক প্রসঙ্গ : ৩৮ ▯ ▯ শব্দরূপ : ৪০ ▯ ▯ চিত্রকথা : ৪১ ▯ ▯ প্রাসঙ্গিকী : ৪২

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৫ বর্ষ ২৫ সংখ্যা, ২৮ মাঘ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৪, ১১ ফেব্রুয়ারি - ২০১৩

দাম : ৭ টাকা

বার্ষিক গ্রাহক মূল্য ৩২৫ টাকা।

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.-
Kol.RMS/48/2013-2015

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com
vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

পূজনীয় সরসঙ্ঘচালক

মাননীয় মোহনরাও ভাগবত-এর উপস্থিতিতে

স্বামী বিবেকানন্দ সার্ধশত সমারোহ সমিতির

উত্তরবঙ্গ প্রান্তের

বিশাল যুব সমাবেশ

স্থান :— বৃন্দাবনী মাঠ, মালদা

তারিখ :— ১৭ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৩

সময় :— বিকাল ৩.০০টায়

HB®

INDIA'S NO. 1 IN ISI MARKED HEAVY PIPE FITTINGS

HB® AN ISO 9002 CERTIFIED CO.

Authorised Distributor

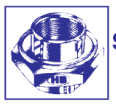

NATIONAL PIPE & SANITARY STORES

54, N. S. Road
Kolkata-700001
Ph : 2210-5831/5833
15, College Street, Kol-12
Ph : 2241 7149 / 8174

Sister Concern

Partha Sarathi Ceramics

4, College Street,
Kolkata-700012
Ph: 2241 6413 / 5986
Fax : 033-22256803
e-mail : nps@vsnl.net
website ;
www\nationalpipes.com

সানরাইজ®

সর্ষে পাউডার

SUNRISE® PURE

স্বাস্থ্য-সম্মত, ঝাঁঝালো - খেতে বড্ড ভালো।

জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী

সম্পাদকীয়

যথোচিত পদক্ষেপ

যে অবিশ্বাস্য দ্রুততায় ভার্মা কমিশন রিপোর্ট পেশ করিয়াছেন তাহা এক কথায় নজিরবিহীন। সেই রিপোর্ট পেশের ১০ দিনের মধ্যেই যৌন নির্যাতনের মোকাবিলায় কেন্দ্রীয় সরকারের অধ্যাদেশ জারির সিদ্ধান্ত এবং সেই সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রপতির অনুমোদন—আমাদের ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতার ক্ষেত্রে এক আশার আলো। গত ডিসেম্বরে (২০১২) দিল্লীতে গণধর্ষণকাণ্ডের প্রতিবাদে সারা দেশে বিক্ষোভের ঢেউ উঠিবার পর কেন্দ্র সরকার বিচারপতি ও এস ভার্মার নেতৃত্বে এক সদস্য বিশিষ্ট কমিশন গঠন করে। এই ধরনের ঘটনার মোকাবিলায় কড়া আইনের ব্যবস্থা করাই ছিল কমিশন গঠনের উদ্দেশ্য। দিল্লীর গর্ণধর্ষণ কাণ্ডে সরকারের বিরুদ্ধে যে 'দেরি'-তে ঘুম ভাঙিবার অভিযোগ উঠিয়াছে, তাহা রোধ করিতেই সরকারের এই তড়িঘড়ি অর্ডিন্যান্স জারির সিদ্ধান্ত। তবে এই দ্রুত সিদ্ধান্ত প্রশংসনীয় হইলেও কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতির আশঙ্কা থাকিয়াই গিয়াছে।

এই অধ্যাদেশে ভারতীয় দণ্ডবিধিতে কয়েকটি ইতিবাচক পদক্ষেপ গ্রহণ করা হইয়াছে। ভার্মা কমিটির রিপোর্টে সার্বিকভাবে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের সমস্যা সমাধানের কথা বলা হইয়াছিল। মৃত্যুদণ্ডের সুপারিশ কমিটি করে নাই। কিন্তু সরকার নৃশংসতম ধর্ষণের ক্ষেত্রে মৃত্যুদণ্ডের ব্যবস্থাও অর্ডিন্যান্সে রাখিয়াছে। ইহা ব্যতীত ধর্ষণ বা গণধর্ষণে ন্যূনতম ২০ বছরের কারাদণ্ড, ধর্ষণ ও অনিচ্ছাকৃত খুনের ক্ষেত্রে আমৃত্যু কারাবাস এবং অক্ষম করিয়া দেওয়ার ব্যবস্থা রাখা হইয়াছে। এই অধ্যাদেশে যৌন নির্যাতনের আওতায় ইভটিজিং, অনুসরণ করা, গায়ে হাত দেওয়া, নগ্ন করিবার চেষ্টা, ব্যক্তিগত অবস্থান লুকাইয়া দেখা, কর্মক্ষেত্রে হয়রানি, অ্যাসিড আক্রমণ, নারী পাচার ইত্যাদি বিষয়গুলিকে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। এক কথায়, সরকার সব ধরনের যৌন নির্যাতনের ক্ষেত্রে কঠোরতর ব্যবস্থা অবলম্বন করিয়াছে।

এই অধ্যাদেশের সমালোচকদের বক্তব্য হইল, সরকার নিজেদের পছন্দমতো কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করিয়া সার্বিকভাবে মহিলাদের বিরুদ্ধে অপরাধের সমস্যা সমাধানের বিষয়টি অগ্রাহ্য করিয়াছে। যেমন যৌন অপরাধে অভিযুক্তরা নির্বাচনে অংশগ্রহণ করিতে পারিবে না। দ্বিতীয়, দাম্পত্যজীবনে সম্মতি ব্যতীত যৌন সংসর্গকে অপরাধের স্বীকৃতি দেওয়া হয় নাই। যৌন অপরাধে অভিযুক্ত জওয়ান ও সেনা আধিকারিকদেরও ফৌজদারি আইনের আওতায় আনা হয় নাই। এই অডিন্যান্স আইনে পরিণত হইলে জীবিকা ও সাংবিধানিক অধিকারে সরাসরি হস্তক্ষেপ করা হইবে বলিয়া আশঙ্কা প্রকাশ করিয়াছে যৌনকর্মীরা।

এইরূপ একটি পরিপ্রেক্ষিতে অর্ডিন্যান্সটি আইনে পরিণত হওয়ার আগে আরও পর্যালোচনা হওয়া উচিত। অবশ্য কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী আর পি এন সিং বলিয়াছেন, এই অর্ডিন্যান্স চূড়ান্ত কিছু নয়। সংসদের স্থায়ী কমিটি ভার্মা কমিশনের সব সুপারিশ খতিয়ে দেখিবে। এই প্রসঙ্গে এই কথাও স্মরণে রাখিতে হইবে যে শুধুমাত্র আইনের মাধ্যমে কোনও শুভ প্রয়াস স্থায়ী হইতে পারে না; প্রশাসনিক উদ্যোগ, পুলিশ ও বিচার বিভাগের সমন্বয়ের মাধ্যমেই তাহা সম্ভব। কেন্দ্র আইন সংশোধন লইয়া দ্রুত অগ্রসর হইলেও ধর্ষণের মামলায় দীর্ঘসূত্রতার চিত্রটি পুনরায় তুলিয়া ধরিয়াছে ন্যাশনাল ক্রাইম ব্যুরো। ব্যুরোর হিসাব অনুযায়ী ২০০৯-১১ সালে সারা দেশে প্রায় ৬৮ হাজার ধর্ষণের অভিযোগ জমা পড়িলেও এখনও মাত্র ১৬ হাজার অভিযুক্ত বিচারে দোষী সাব্যস্ত হইয়াছে। যৌন নির্যাতনের বিরুদ্ধে এই অর্ডিন্যান্স তাই সঠিক পদক্ষেপ হইলেও আরও বিচার-বিবেচনার প্রয়োজন রহিয়াছে।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

কতকগুলি সত্য আছে, যেগুলি কেবল বিশেষ দেশ-কাল-পাত্রে বিশেষ অবস্থায় সত্য। সেগুলি বিশেষ যুগের বিধান হিসাবে সত্য। আবার কতকগুলি সত্য আছে, সেগুলি মানবপ্রকৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। যতদিন মানুষের অস্তিত্ব থাকিবে, সেগুলিও ততদিন থাকিবে। এই শেষোক্ত সত্যগুলি সর্বজনীন ও সার্বকালিক; আর যদিও আমাদের ভারতীয় সমাজে নিশ্চয়ই অনেক পরিবর্তন ঘটিয়াছে, আমাদের আহার-বিহার পোশাক-পরিচ্ছদ উপাসনাপ্রণালী, এ-সকলই যদিও অনেক বদলাইয়াছে, কিন্তু এই শ্রৌত সর্বজনীন সত্যসমূহ—বেদান্তের এই অপূর্ব তত্ত্বরাশি—স্বমহিমায় অচল, অজেয় ও অবিনাশী হইয়া রহিয়াছে।

—স্বামী বিবেকানন্দ।

সংবাদ প্রতিবেদন

বোরখা পরা বিবাহিত মেয়েদের মধ্যে মঙ্গলসূত্র ও বালা পরার আগ্রহ বাড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সুমাইরা বোরখা পরে দিল্লীর ব্যস্ত জামা মসজিদের কাছ দিয়ে হাঁটছিল। অন্য মুসলমান রমণীরা বোরখা পরে যেভাবে চলে যায় তেমনই চলন ছিল সুমাইরারও। হঠাৎ দেখতে পাওয়া গেল তার আন্দোলিত হাত দুটো। সেল ফোনে সহাস্যমুখে কারও সঙ্গে কথা বলছে। তার দু' হাতে উজ্জ্বল লাল বর্ণের চুড়ির সারি। সাধারণত ওইরকম চুড়ি পরে সদ্য-বিবাহিত হিন্দু মেয়েরা। হাল আমলে দেখা যাচ্ছে, ভারতে তো বটেই এমনকী পাকিস্তানেও মুসলমান তরুণীরা বালা, চুড়ি, মঙ্গলসূত্র পরছে। তাছাড়া তাদের কপালে সিঁদুরও থাকছে। এর মধ্যে তারা কোনও সংস্কার দেখছে না। বরং ফ্যাশন হিসেবে গ্রহণ করছে। আর এতে তাদের দেখে মনে হয় সদ্য পরিণীতা।

একুশ বছর বয়সী সুমাইরা বলেছে, 'বালা বা চুড়ি পরলেই আমি হিন্দু হয়ে গেলাম না বা কম মুসলমান হলাম না। দেখুন, মুসলমান মেয়েদের মধ্যে যাদের বিয়ে হয়েছে আর যাদের হয়নি আলাদা করা যায় না। আমি তো ছোটবেলা থেকেই চুড়ি পরতাম। যখন বড় হলাম তখনও। আমার বিয়ের কথা পাকা হওয়ার পর আমি প্রথম কিনেছিলাম বালা। আমার খুড়তোত বোন সাইমাও তার বিয়ের সময় বালা পরেছে। কদিন আগে তার বিয়ে হয়েছে।' কোনও আত্মীয় এ ব্যাপারে আপত্তি করেনি।

শুধু চুড়ি নয়, মঙ্গলসূত্রেরও চাহিদা বাড়ছে। আর তা কেবল ভারতে নয়, পাকিস্তানেও। অনেকে তৈরি করিয়ে পাঠাবার জন্যে বলছে। কেউ কেউ বলছেন, এটা একটা জনপ্রিয় 'শাশুড়ি-বধূ' ধারাবাহিক টেলিভিশন কাহিনীর প্রভাবে ঘটেছে।

দু-বছর আগে করাচীর বাসিন্দা নাসিমা আজিজ এসেছিলেন দিল্লীতে এক আত্মীয়ের বাড়ি। আত্মীয়রা অবাক হন নাসিমা করালবাগ থেকে সাতটা হীরে লাগানো মঙ্গলসূত্র কেনায়। নাসিমা জানান, 'মঙ্গলসূত্র পরলে গলার সৌন্দর্য বাড়ে। এটা পছন্দের ব্যাপার। দোষের কিছুই নেই। আর বেশ মানাচ্ছেও। পাকিস্তানে

দিদির দেখাদেখি সাইমার হাতেও উঠে এসেছে বালা।

সকলে জানে আমি মুসলমান। মঙ্গলসূত্র পরার জন্যে কেউ আমাকে হিন্দু ভাবেনি।'

রাজধানীর স্বর্ণ-ব্যবসায়ীরা স্বীকার করেছেন যে মুসলমান মেয়েদের মধ্যে এভাবে গয়না প্রীতি বাড়ার খবরটা। স্বর্ণ-ব্যবসায়ী অঙ্কিত কোহলি বলেছেন, 'গত দু-তিন বছরে মুসলমানদের মধ্যে মঙ্গলসূত্র কেনার আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। কেউ কেউ বোরখা পরে এসে মঙ্গলসূত্র চাইছে। হীরে বসানো মঙ্গলসূত্র চাইছে অনেকে।'

মঙ্গলসূত্র আর চুড়ি পরার চলন সম্পর্কে যুক্তি না হয় মানা গেল, কিন্তু সিঁদুর পরার ব্যাপারও এলো কীভাবে? বিশেষ করে সিঁদুর যখন হিন্দু মেয়েদের এয়োতির চিহ্ন এমনকী যা ধর্মীয়, তা মুসলমান মেয়েরা গ্রহণ করছে। তবে হিন্দু মেয়েরা গাঢ় লাল সিঁদুর পছন্দ করে, মুসলমান মেয়েরা বেছে নিচ্ছে কমলা রঙ। কলকাতায় দু' রকম রঙের সিঁদুর দেখে বোঝা সহজ হয় কে হিন্দু, কে মুসলমান পরিবারের মেয়ে।

কলকাতার রিজওয়ানা দেখেছে তার মাকে কমলা রঙের সিঁদুর সিঁথিতে লাগাতে। ২০১০ সালে ২৪ বছরের রিজওয়ানার যখন বিয়ে হয় তখন তার প্রশ্ন ছিল, এখানে হিন্দুরা লাল, মুসলমানরা কমলা রঙের সিঁদুর পরে। দিল্লীতেও কি তাই রীতি?

SATYA NARAYAN ACADEMY

C.B.S.E. AFFILIATED HIGHER SECONDARY RESIDENTIAL CO-EDUCATIONAL WITH SCIENCE & COMMERCE STREAM
BOOK YOUR SEAT IMMEDIATELY.

CAMPUS AT : RAMAKRISHNA NAGAR
BANKURA - 722155
CONTACT - 9433175048 / 9732063765

ADVT.

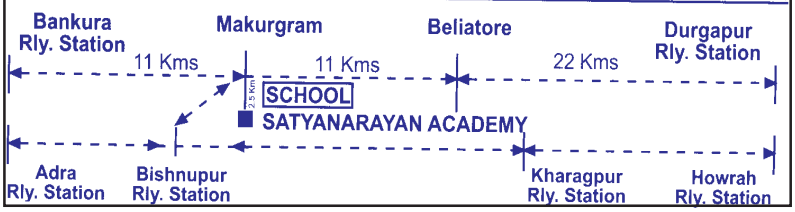

জোড়া ফলায় ভারতকে বিদ্ধ করতে চাইছে চীন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ একদিকে সমুদ্র, অন্যদিকে পাহাড়— চীনের এই দ্বিমুখী আক্রমণের সামনে সরাসরি ভারত। ২০১১ সালেই পাকিস্তানের প্রতিরক্ষা মন্ত্রক ঘোষণা করেছিল ইসলামাবাদ গদর বন্দরের মালিকানা একটি চীনা কোম্পানীর হাতে ছাড়বে। চীনের 'মুক্তোর মালা' কৌশলের পরিপ্রেক্ষিতেই এহেন সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে। বেজিং সম্প্রতি ঘোষণা করেছে গদরকে 'শক্তি-প্রবাহ'-এর মাধ্যম হিসেবেও ব্যবহার করা হবে। যেমন চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে গদর-বন্দর থেকে তেল ও গ্যাস সরবরাহ হবে। আর এখানেই দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের আশঙ্কা ভারতকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু করতেই পাক-চীনের এই যৌথ পরিকল্পনা। এদিকে বহু টালবাহানার পর চীনের সীমান্ত এলাকায় পর্বত-অভিজ্ঞ সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে চলেছে ভারত। প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের আশঙ্কা ভারত-তিব্বত সীমান্তকে ব্যবহার করে কার্গিল কায়দায় ভারতের মাটি দখলের চেষ্টা করতে চাইবে চীন। প্রতিরক্ষা দপ্তর সূত্রে জানা যাচ্ছে, পাহাড়ে নতুনভাবে ৮৯ হাজার সেনা ও ৪০০ সেনা আধিকারিক মোতায়েন করতে চলেছে ভারত। মূলত এরাজ্যের পানাগড় সহ আরও দুটি সেনা-ডিভিশন থেকেই এই সৈন্যরা আসবেন।

আফগানিস্তানের নিকটবর্তী বালুচিস্তান থেকে আমেরিকা তার সৈন্যবাহিনী প্রত্যাহার করে নিতেই আসরে নামে চীন। চীনকে তাদের জমি দখল করতে দিতে প্রবল আপত্তি ছিল বালুচিস্তানের মানুষের। ওই সময় নানা কারণে গদর বন্দরের মালিকানা আন্তর্জাতিক চীনা সংস্থা পোর্ট অব সিঙ্গাপুর অথরিটির হাতে আসায় যারপরনাই আনন্দিত হয় চীনা সেনাবাহিনী। ওই সংস্থাটির বকলমে বন্দরের দেখভালের দায়িত্ব একপ্রকার চীনা সেনাবাহিনীর হাতেই বর্তায়। এবং প্রাথমিক পর্যায়েই তারা জব্দ করে ফেলেছে বালুচিস্তানকে। আন্তর্জাতিক সংবাদ-সংস্থার

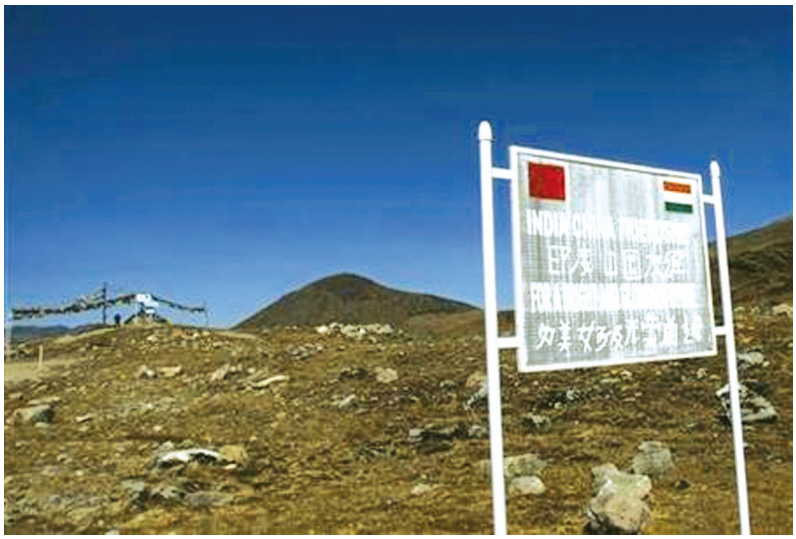

ভারত-চীন সীমান্ত।

রিপোর্ট অনুসারে তালিবান দখলে থাকাকালীন বালুচিস্তানে যে নৃশংসতার নিদর্শন দেখা গিয়েছিল, চীনা আমল তাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে। আন্তর্জাতিক চোরাচালানকারীদের কাছেও গদর বন্দর ইদানীংকালে 'স্বর্গরাজ্য' হয়ে উঠেছে।

ভারতের পক্ষে অত্যন্ত আশঙ্কার বিষয় এই যে পাকিস্তান আশা করছে চীন বন্দরটিকে নৌ-ঘাঁটিতে পরিণত করবে। গোদের ওপর বিষফোঁড়ার মতো বন্দর থেকে চীনের জিনজিয়াং প্রদেশে তেল ও গ্যাস সরবরাহ হওয়ায় মালাক্কা ও দক্ষিণ চীন সাগরে চীনের একচ্ছত্র আধিপত্য কায়েম হবে এবং ভারতকে আক্রমণ করা তাদের পক্ষে সহজতর হয়ে উঠবে।

অন্যদিকে ভিয়েতনাম ও ফিলিপাইন-এর সঙ্গে এলাকা দখল নিয়ে যে সমস্যা চীনকে ব্যতিব্যস্ত রেখেছে এর ফলে তা কাটিয়ে ভারতকে আক্রমণের দিকে তাদের মনোযোগ দিতে আরও সুবিধে হবে বলে নিরাপত্তা বিশেষজ্ঞদের আশঙ্কা।

এদিকে তিব্বত সীমান্তবর্তী পাহাড়কে কেন্দ্র করে অরুণাচলের তাওয়াং দখলের ছক চীনের বহুদিনের। তাদের এই পরিকল্পনা বানচাল করতে ২০১০ সালেই পাহাড়-অভিজ্ঞ সেনা মোতায়েনের প্রস্তাব পাশ করা হয়। কিন্তু কেন্দ্রের অপদার্থতায় নিরাপত্তাজনিত ক্যাবিনেট কমিটিতে আসতে প্রস্তাবটির সময় লেগে যায় পাক্কা এক বছর। গত বছর প্রস্তাবটিকে ভালভাবে সমীক্ষা করার জন্য ও এনিয়ে একটি সাধারণ পরিকল্পনা গ্রহণ করার নোট দিয়ে প্রস্তাবটিকে ফিরিয়ে দেওয়াও হয়। এদিকে সেনাপ্রধান বদল হওয়ায় টালবাহানা আরও দীর্ঘপ্রসূত হয়। অবশেষে দেরিতে হলেও ঘুম ভেঙ্গেছে সরকারের।

পাহাড়-অভিজ্ঞ সেনা মোতায়েনের জন্য সরকারের খরচ পড়বে প্রায় ৬৫,০০০ কোটি টাকা। দেশের বর্তমান আর্থিক সংকটে এত বিপুল ব্যয় অর্থমন্ত্রকের তরফে রীতিমতো কষ্টসাধ্য মনে হলেও চীনা-বিপদকে এড়ানোর সাধ্যি যে আর নেই তা বুঝতে পারছে সরকারের সব মহলই। চীন ইতিমধ্যেই এনিয়ে ভারতের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলতে শুরু করেছে। কূটনীতিকদের বিশ্বাস পূর্ব যুদ্ধ-ক্ষেত্র হাতছাড়া হওয়ার আশঙ্কাই চীনকে তার কণ্ঠস্বর উচ্চকিত করতে প্ররোচিত করেছে।

নকশাল মোকাবিলায় ইউ এ ভি চায় সি আর পি এফ

ফাইল চিত্র

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সেন্ট্রাল রিজার্ভ পুলিশ ফোর্স (সি আর পি এফ) আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাওয়া এয়রো ইন্ডিয়া সো বা ভারতীয় নভোযান প্রদর্শনী ২০১৩-র জন্য কিনতে চলেছে ইউ এভি (আনম্যানড এরিয়াল ভেহিকল বা চালকবিহীন নভোযান)। কিছুদিন আগে সি আর পি এফ-এর পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রককে লেখা একটি চিঠিতে ইউ এ ভি কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করে জানানো হয়েছে ছত্তিশগড়, ঝাড়খন্ড, ওড়িশা ও বিহারের পক্ষ থেকে কেননা ফলে নকশাল মোকাবিলায় সুবিধে হবে। সি আর পি এফের এক বরিষ্ঠ আধিকারিকের কথায়, ''এই বিষয়ে কিছু সমস্যা রয়েছে। আমরা যখন ইউ এ ভি ব্যবহার করতে চাই, ভারতীয় বায়ুসেনার ওপর আমাদের নির্ভর করতে হয়। কিন্তু বায়ুসেনার আধিকারিকদের তো আর জঙ্গলে পাওয়া যায় না। এই ভূ-খণ্ড সম্বন্ধে তাঁরা বিশেষ কিছু জানেনও না। ফলে তাদের বিশেষজ্ঞদের ওপরই আমাদের নির্ভর করতে হয়। তাই এই অতিরিক্ত সুবিধাটুকু আমরা পেতে চাইছি।'' আধিকারিকরা আরও জানিয়েছেন তাঁরা ব্যাঙ্গালোর যাচ্ছেন একজন পছন্দসই বিক্রেতার খোঁজে যাঁরা হয় ইউ এ ভি বেচবেন কিংবা ভাড়া দেবেন। আপাতত এ-সংক্রান্ত 'আধুনিকীকরণে'র তহবিল থেকেই টাকা আসবে। সাম্প্রতিক লাতেহার গুলি-বিনিময় কাণ্ডের পর মাওনেতা অরবিন্দের সঠিক অবস্থান খুঁজে বের করতে ইউ এ ভি ব্যবহার করতে চাইছেন সি আর পি এফ কর্তৃপক্ষ। এন টি আর ও (ন্যাশনাল টেকনিক্যাল রিসার্চ অর্গানাইজেশন (এন টি আর ও)-র হাতে তিনটি ইউ এ ভি রয়েছে। যেগুলি তার কেন্দ্র হায়দরাবাদে ব্যবহৃত হয়। তারা সি আর পি এফের ইউ এ ভি ব্যবহারের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেছে।

প্রধানমন্ত্রীর দৌড়ে দেশের সন্ত সমাজের পছন্দ মোদী-ই

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ প্রধানমন্ত্রিত্বের দৌড়ে দেশের সন্ত সমাজের কাছে এই মুহূর্তে সবচেয়ে পছন্দের নাম অবশ্যই নরেন্দ্রভাই মোদী। আগামী ৬-৭ ফেব্রুয়ারি মহাকুম্ভ উপলক্ষে দেশের সন্ত সমাজ এক জায়গায় মিলিত হচ্ছেন। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সেখানেই তাঁরা মোদীকে প্রধানমন্ত্রী করার জন্য দেশের মানুষের কাছে আহ্বান জানাবেন। উত্তরপ্রদেশের বিজেপি সভাপতি লক্ষ্মীকান্ত বাজপেয়ী জানিয়েছেন রাজনাথ সিং ৬ ফেব্রুয়ারিই পৌঁছে যাচ্ছেন কুম্ভে। অন্যদিকে সন্ত সমাজের আশীর্বাদ নিতে মোদী পৌঁছচ্ছেন ৭ তারিখ। আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা না হলেও সন্ত সমাজের মনোভাব প্রকাশ্যে আসায় এই প্রতিবেদন লেখার সময়

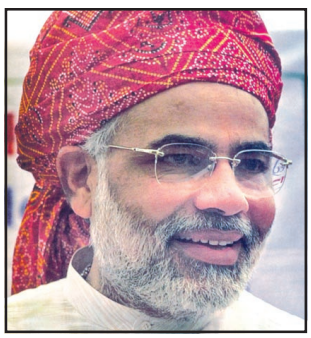

অবধি দেশজুড়ে এনিয়ে আলাদা উদ্দীপনার সৃষ্টি হয়েছে। কিছুদিন আগেই একটি আপাদমস্তক মোদী-বিরোধী বেসরকারি সংস্থা জনমত যাচাই করে স্বীকার করে নিতে বাধ্য হয়েছে যে প্রধানমন্ত্রিত্বের দৌড়ে নরেন্দ্র মোদী মনমোহনকে তো বটেই, এমনকী কংগ্রেসের 'প্রজেক্টেড প্রধানমন্ত্রী' রাহুল গান্ধীকেও কয়েক যোজন পেছনে ফেলে দিয়েছেন। কংগ্রেসি-রা এর মধ্যে অবশ্য সাধু-সন্তদের 'চক্রান্ত' ছাড়াও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের 'কালো ছায়া'ও দেখতে পাচ্ছেন। যদিও দেশবাসী স্পষ্টই মনে করছেন, দেশের প্রধানমন্ত্রী ঠিক করার অধিকার একমাত্র সাধু-সন্তদেরই আছে, সন্ত্রাসবাদীদের নিশ্চয়ই নেই। সাধু-সন্তদের মনোভাব বুঝে রাজনৈতিক কারণে মুসলিমদের কিছু সংগঠন মোদীর বিরুদ্ধে মাঠে নেমে পড়েছে। তাদের উত্তেজনাকর বিবৃতিতে রীতিমতো মদত যোগাচ্ছে কংগ্রেস এবং যার জন্য এনিয়ে দেশজুড়ে অস্বস্তিকর পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হচ্ছে।

গূঢ়পুরুষের

কলম

উন্নয়ন নয়, নিজস্ব 'আইডেনটিটি'র জন্যই গোর্খাল্যান্ডের দাবী

দার্জিলিং পাহাড়ে আবার হিংসার কালোছায়া ঘনাচ্ছে। এর জন্য দায়ী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁর সরকার। পাহাড়ে গোর্খারা পৃথক রাজ্যের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছিল গত ৮০-র দশকের মাঝামাঝি। তখন ক্ষমতাসীন বামফ্রন্ট সরকারের বিশ্লেষণ ছিল, পৃথক রাজ্য নয়, গোর্খাল্যান্ডের দাবি আসলে উন্নয়নের দাবি। তাই স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে উন্নয়ন প্রকল্পের কাজকর্ম গোর্খা নেতাদের হাতে ছেড়ে দিলেই সব সমস্যা মিটে যাবে। গোর্খা নেতা সুবাস ঘিসিংয়ের নেতৃত্বে ১৯৮৮ সালে গড়া হয় দার্জিলিং গোর্খা হিল কাউন্সিল। লাভ হয়নি কিছুই। উল্টে অভিযোগ ওঠে যে সুবাস ঘিসিং নিজে এবং তাঁর সঙ্গীরা উন্নয়নের কেন্দ্রীয় বরাদ্দ আত্মসাৎ করে কোটিপতি হয়েছেন। বামফ্রন্ট সরকার বা বলা ভাল সিপিএম পার্টির স্বার্থে সব জেনেও নির্বিকার ছিল। বরং, সুবাস ঘিসিংয়ের জনপ্রিয়তায় ভাটার টান দেখে তখন আলিমুদ্দিনের কমরেডরা স্বপ্ন দেখছেন পাহাড়ে আবার পার্টির রমরমা শুরু হবে। বলতে বাধা নেই প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর ইচ্ছাতেই সেদিন প্রশাসন ঘিসিং-এর দুর্নীতি নিয়ে টুঁ শব্দটি করেনি। বহুদর্শী কমরেড বসু জানতেন, আর্থিক দুর্নীতি এমন একটি অস্ত্র যা যে কোনও আন্দোলনের মেরুদণ্ড ভেঙে দিতে পারে। পাহাড়ে যে নেতারা দুটো পোড়া রুটি সবজি খেয়ে জীবন কাটিয়েছেন, তাঁদের যদি পাঁচতারা হোটেলে থাকা খাওয়ার পাকা ব্যবস্থা করে দেওয়া যায় তবে আর প্রতিবাদী চরিত্রবল থাকে না। এই পথেই জ্যোতিবাবুরা শেষ করে দেন সুবাস ঘিসিং এবং তাঁর জি এন এল এফ দলকে।

তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় জ্যোতিবাবুদের দেখানো পথেই হেঁটে ঘিসিং-এর হিল কাউন্সিল ভেঙে দিয়ে গড়ে দিয়েছেন, গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অথরিটি বা জিটিএ। অর্থাৎ বোতলটি নতুন। কিন্তু বোতলের ভেতরের তরল পদার্থটি সেই পুরাতন সিপিএম মার্কা। সিপিএমও উন্নয়ন চাই বলে গলাবাজি করেছে। মমতাও মনে করেন পাহাড়ে উন্নয়নের বন্যা বইয়ে দিলেই গোর্খা জনতা রাতারাতি তৃণমূল হয়ে যাবে। বাস্তব অবস্থাটি জ্যোতি -বুদ্ধ থেকে মা-মাটি-মানুষের নেত্রী কেউই বোঝেননি। অথবা বুঝতে চাননি। পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবি আসলে গোর্খাদের নিজস্ব 'আইডেন্টিটি'-র দাবি। কখনই উন্নয়নের দাবি নয়। পৃথক তেলেঙ্গানা রাজ্যের দাবির সঙ্গে তাই একে গুলিয়ে ফেলা যাবে না। তেলেঙ্গানা রাজ্যের দাবি উঠেছে উন্নয়নের প্রশ্নে। পৃথক ভাষা বা পরিচয়ের দাবিতে নয়।

সুবাস ঘিসিং

বিমল গুরুং

মাত্র ১৫ মাস আগে জুলাই, ২০১২-তে ত্রিপাক্ষিক বৈঠকে গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অথরিটি (জিটিএ) গড়া হয়। এই বৈঠকে যে সর্বসম্মত চুক্তি হয় তাতে সই করেছিলেন কেন্দ্র, রাজ্য এবং গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার প্রতিনিধিরা। বৈঠকের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সাংবাদিকদের বলেছিলেন, 'পাহাড় হাসছে, জঙ্গলমহলে শান্তি ফিরেছে।' মোর্চা নেতারাও সেদিন সায় দিয়েছিলেন মমতার কথায়। যে বিমল গুরুং বুধবার হুমকি দিয়েছেন পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে রক্তাক্ত আন্দোলন শুরু করার সেই তিনি তখন বলেছিলেন, 'মমতা আমাদের পাহাড়ের মা'। ত্রিপাক্ষিক চুক্তির পর মমতার প্রথম দার্জিলিং সফরের সময় হিলকার্ট রোডের প্রতিটি বাঁকে ফেস্টুন ঝোলানো হয়, 'মুখ্যমন্ত্রী লাই হামরো তরা বরা হার্দিক স্বাগত ছ'। মুখ্যমন্ত্রীকে আমাদের পাহাড়ে স্বাগত জানাই। সেই মুখ্যমন্ত্রীকে দার্জিলিং পাহাড়ে এবার তাঁর অষ্টম সফরে শুনতে হয়েছে, 'গো ব্যাক, পাহাড় বাংলার অংশ নয়।' তাঁর সরকারের বয়স ২০ মাস পূর্ণ হওয়ার প্রাক লগ্নেই শুনতে হয়েছে পাহাড়ের মানুষ পৃথক রাজ্য চায়। তারা রক্ত ঝরাতে প্রস্তুত। হাসি নয়, হিংস্রতায় পাহাড় ক্রমশ উত্তপ্ত হচ্ছে।

দৃশ্যপটের এত দ্রুত পরিবর্তনের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা-মাটি-মানুষের সরকার মোটেই প্রস্তুত ছিল না। অথচ গত ২০ জানুয়ারি দার্জিলিং শহরে মোর্চা রীতিমত জনসভা করে ঘোষণা করেছিল, পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে গণআন্দোলন শুরু করা হচ্ছে। বুধবার মোর্চার সভাপতি বিমল গুরুং মুখ্যমন্ত্রীকে এক মঞ্চে পেয়ে গুরুংয়ের সমর্থকরা দলীয় পতাকা হাতে পৃথক গোর্খাল্যান্ডের দাবিতে সোচ্চার হন। ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী কড়া ভাষায় ধমক দিয়েও উত্তরবঙ্গ উৎসবের ছন্দপতন আটকাতে পারেননি। মুখ্যমন্ত্রীকে সরকারি মঞ্চ থেকে নেমে দর্শকাসনে বসতে হয়। দৃশ্যতই তিনি এমন একটা পরিস্থিতির জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। এই অপমানের জবাব দিতেই তিনি মোর্চা নেতাদের সঙ্গে তাঁর বৈঠক বাতিল করে সোজা কালিম্পং চলে যান রাত্রিবাসের জন্য। কালিম্পং শহরের বাইরে তিনি বুধবার রাত কাটান। পরেরদিন তিনি শুধু সেখানের লেপচা উপজাতির প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলে ঘোষণা করেছেন, রাজ্য সরকার লেপচাদের উন্নয়নের জন্য বিশেষ পর্ষদ গঠন করবে। বলে দেন, লেপচারাই পাহাড়ের আদি ভূমিপুত্র। এতে আগুনে ঘৃতাহুতি পড়ে। বিমল গুরুং বুধবার সোজাসুজি বলেই দেন,

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পাহাড়ের মানুষের ঐক্য ভাঙতে শুধুই লেপচাদের জন্য পৃথক উন্নয়ন পর্ষদ গঠন করতে চাইছেন। এই বিভাজন নীতি মোর্চা মানবে না। গোর্খাল্যান্ডের দাবি মোটেই নতুন নয়। বৃটিশ শাসিত ভারতে ১৯০৭ সালে হিলস্‌মেন অ্যাসোসিয়েশন অব দার্জিলিং পৃথক প্রশাসনের দাবিতে মিন্টো-মর্লে রিফর্মস কমিশনের কাছে স্মারকলিপি দেয়। স্মারকলিপিতে বলা হয়েছিল দার্জিলিং পাহাড়ের মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল বাংলার সমতলের থেকে পৃথক। তাই সমতল থেকে দার্জিলিং পাহাড়ের প্রশাসনকে পৃথক করা প্রয়োজন। স্বাধীনতার পর পাহাড়ের মানুষের নিজস্ব রাজনৈতিক দল অখিল ভারতীয় গোর্খা লিগ গড়ে ওঠে। গোর্খা লিগ দাবি করে পাহাড়ের মানুষকে 'এথনিক আইডেন্টিটি' দিতে হবে রাজ্য সরকারকে। ১৯৮০ সালে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীকে এই দাবিপত্র দেয় লিগ। বলা হয়, দার্জিলিং পাহাড়ের নেপালিদের গোর্খা আইডেন্টিটি দিতে সংবিধান সংশোধন করতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকার এই দাবি মেনে না নিলে নরমপন্থী গোর্খা লিগকে হঠিয়ে দিয়ে নেতৃত্বের দখল নেয় সুবাস ঘিসিং-এর দল জি এন এল এফ। ৮০-র দশকের মাঝামাঝি ঘিসিং- এর নেতৃত্বে পাহাড়ে শুরু হয় এক ভয়াবহ রক্তক্ষয়ী আন্দোলন। সরকারিভাবে বলা হয় দাঙ্গা হাঙ্গামায় ১২০০ মানুষ প্রাণ হারান। বেসরকারিভাবে মৃতের সংখ্যা আরও বেশি বলে দাবি করা হয়। পশ্চিমবঙ্গে তখন বামফ্রন্ট দ্বিতীয়বারের জন্য ক্ষমতায় এসেছে। অবশেষে রাজ্যের প্রয়াত মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর হস্তক্ষেপে গঠিত হয় গোর্খা হিল কাউন্সিল। তবু পাহাড়ে প্রত্যাশিত শান্তি ফেরে না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখ্যমন্ত্রীত্বে তৃণমূল সরকার ২০১১ সালে ক্ষমতায় এসে প্রথমেই পাহাড়ে শান্তি ফেরাতে উদ্যোগী হয়। তখন সমতলের পার্টি সিপিএমের সঙ্গে আপোষ করা এবং আর্থিক দুর্নীতির অভিযোগে জি এন এল এফ নেতা সুবাস ঘিসিং দার্জিলিং থেকে বিতাড়িত। ক্ষমতা দখল করেছেন গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার নেতা বিমল গুরুং— মদন তামাংরা। তাঁদের শান্ত করতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দার্জিলিং পাহাড়ের উন্নয়নের জন্য গড়ে দেন গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অথরিটি (জি টি এ)। প্রতিশ্রুতি দেন পাহাড়ের উন্নয়ন প্রকল্পের সব কাজই স্বাধীনভাবে জি টি এ করবে। মোর্চা নেতারা অভিযোগ করেছেন, 'দিদি তাঁর প্রতিশ্রুতি পালন করেননি। পাহাড়ের প্রশাসন চলছে সেই কলকাতার মহাকরণ থেকে। জেলাশাসক জি টি এ কে পাত্তা দেন না।' বিমল গুরুং খোলাখুলি অভিযোগ করেছেন, দার্জিলিং এর মাটিতে 'উত্তরবঙ্গ উৎসব'-এর ব্যাপারে তাঁদের সঙ্গে জেলাশাসক সৌমিত্র মোহন কোনও আলোচনাই করেননি। দার্জিলিং পাহাড়ে এখন জি টি এ এবং রাজ্য সরকারের দুটি পৃথক সমান্তরাল প্রশাসন চলছে। এখানে রাজ্য পুলিশ চলছে এস পি-র অধীনে। আবার গোর্খাল্যান্ড পুলিশ বাহিনী চলে বিমল গুরুংদের নির্দেশে। মাঝে মধ্যেই দুই বাহিনীর মধ্যে মারপিট হয়। পাহাড়ের ব্যবসায়ীদের উভয়কেই খুশি রাখতে দুই বাহিনীকেই 'তোলা' দিতে হয়। এইভাবে পাহাড়ে যে শান্তি ফেরানো যায় না সেকথা মমতাকে বোঝাবে কে?

শান্তি স্থাপনকারীরাই ধন্য, তারাই পৃথিবী ভোগ করবে। আর ওইসব অহঙ্কারের নীতি হুমড়ি খেয়ে পড়ে যাবে। ওগুলি বালির উপর নির্মিত। বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারে না। স্বার্থপরতার ভিত্তির ওপর যা কিছু রচিত, প্রতিযোগিতা যার প্রধান সহায়, ভোগ যার লক্ষ্য, আজ নয় কাল তার ধ্বংস হবেই। এ জিনিস মরবেই।

— স্বামী বিবেকানন্দ
(বাণী ও রচনা, ৫/৪১৭-১৮)

—ঃ সৌজন্যে ঃ—
জনৈক শুভানুধ্যায়ী

বুদ্ধবাবুকে প্রশ্ন করে বিরক্ত করবেন না প্লিজ

নন্দীগ্রামে যাঁর নির্দেশে পুলিশ গিয়েছিল গুলি চালনার তদন্তে সেই বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না কেন? এই প্রশ্ন তুলে সিবিআইয়ের কাছে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করার আর্জি জানিয়ে চিঠি পাঠিয়েছে রাজ্য। সুতরাং বুদ্ধবাবু আপনি পঞ্চায়েত ভোটের মুখে নিশ্চিত নতুন করে অস্বস্তিতে পড়েছেন। তবে আস্থা রাখতে পারেন, কংগ্রেস আপনার বিরুদ্ধে কিছুই করতে দেবে না। সিবিআই ওই চিঠি বাতিল কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দেবে।

কিন্তু আপনি নিজে বলুন তো এমন প্রশ্ন ওঠাটা কি সমীচীন নয়? আপনি কি সত্যিই সব দায় এড়িয়ে যেতে পারেন?

নন্দীগ্রামে গুলি চলেছিল ২০০৭ সালের ১৪ মার্চ। নিরস্ত্র মানুষের মিছিলের ওপর পুলিশের গুলি কেড়ে নিয়েছিল ১৪টি প্রাণ। সে সময় শুধু পুলিশ নয়, সিপিএম কর্মীরা পুলিশের আড়ালে থেকে গুলি চালিয়েছিল বলেও অভিযোগ ওঠে। সেই কাণ্ডকে হাড় হিম করা পরিবেশ বলে মনে হয়েছিল তৎকালীন রাজ্যপাল গোপালকৃষ্ণ গান্ধীর। আর সেই সময় আত্মগর্বে আপনি মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য বলেছিলেন, দে হ্যাভ পে ব্যাক বাই দেয়ার ওন কয়েন।

রাজ্য রাজনীতি তখন উত্তাল হয়ে উঠেছিল। বুদ্ধিজীবী থেকে সাধারণ মানুষ প্রতিবাদে রাস্তায় নেমেছিল। শেষ পর্যন্ত গুলিচালনার দায় নিজের কাঁধ থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারেননি। মহাকরণে দাঁড়িয়ে বলেছিলেন ভুলটা আমাদের। সেই আমাদের বলতে ঠিক কী বোঝাতে চেয়েছিলেন? সে জবাব দেননি। আপনার সেই কাচুমাচু মুখটা মনে আছে। আলিমুদ্দিন স্ট্রিটকে নিশ্চয়ই কাঠগড়ায় দাঁড় করাননি। গোটা বিষয়টাই তো হয়েছিল আপনার নির্দেশে।

আলিমুদ্দিন স্ট্রিটের কর্তারা গুলিচালনাকে সূর্যোদয় বলে ব্যাখ্যা করলেও কলকাতা হাইকোর্ট জানিয়ে দেয় ওই ঘটনা বেআইনি ও অসাংবিধানিক। অভিযুক্ত পুলিশ কর্মী ও অফিসারদের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা করারও নির্দেশ দেয়। কিন্তু বুদ্ধবাবু আপনার সরকার সেই রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানায়। এরপর তৃণমূল কংগ্রেস সরকার গঠন করলে গত বছর

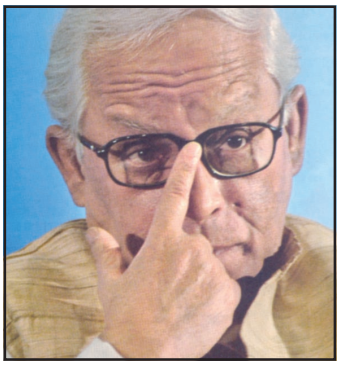

ফেব্রুয়ারি মাসে সর্বোচ্চ আদালত থেকে সেই মামলা তুলে নেওয়া হয়। ফের শুরু হয় সিবিআই তদন্ত। সিবিআই কর্তারা ওই ঘটনায় জড়িত বলে অভিযুক্ত সিপিএম নেতা থেকে পুলিশ কর্মী ও অফিসারদের জেরা করেন। জিজ্ঞাসাবাদ করা হয় কয়েকজন আই এ এস, আই পি এস-কেও। কিন্তু সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কর্তা প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী আপনাকে এখনও তদন্তকারীদের সামনে কোনও জবাব দিতে হয়নি। এবার সেই দাবিই তুলল রাজ্য সরকার।

রাজ্যে পঞ্চায়েত ভোট এখন শুধু দিন ঘোষণার অপেক্ষা। ইতিমধ্যেই প্রচারে নেমে পড়েছে আপনার দল সিপিএম। আর সেই প্রচারে আপনি বারে বারে নন্দীগ্রাম প্রসঙ্গ তুলছেন। বোঝাতে চাইছেন রাজ্যের ভালোর জন্যই নন্দীগ্রামকে বেছেছিলেন। আর একটা হলদিয়া বানাতে চেয়েছিলেন। আগে গুলিচালনাকে ভুল স্বীকার করলেও এখন বলছেন, সব গোলমাল পাকিয়েছিল বিরোধীরাই। তৃণমূল কংগ্রেস যে রাজনৈতিক জমি দখলের জন্য নন্দীগ্রামকে বেছে নিয়েছিল তা নিয়ে কোনও দ্বিমত নেই। কিন্তু খেজুরিকে কেন্দ্র করে আপনারা যে লড়াই চালিয়েছিলেন সেটাও তো কম রক্তাক্ত ছিল না। রাজনৈতিক জমি দখলের জন্যই তো আপনারা নন্দীগ্রাম পুনর্দখলের ডাক দিয়েছিলেন। নির্বিচারে গুলি চালাতে দ্বিধা করেনি আপনার দলের সম্পদরা। লক্ষ্মন শেঠের নেতৃত্বে সেই লড়াইয়েরও সাক্ষী রাজ্যবাসী। জননী ইটভাটার সেই অস্ত্রভাণ্ডারের কথা আপনার প্রশাসন জানত না? যদি জেনে থাকে তবে তো জবাব দিতেই হবে। আর না জেনে থাকলে সে জবাবও তো আপনাকেই দিতে হবে। এখন আপনি পাম এভিনিউতে বসে সেসব ভুলে গেলে তো চলবে না। শুধু বিরোধীদের দিকে আঙুল তোলার আগে একটু আয়নার সামনে দাঁড়ান কমরেড।

আগের পঞ্চায়েত ভোটেই নন্দীগ্রামের জবাব মিলেছে। এরপর বিধানসভা নির্বাচন ক্ষমতাচ্যুত করেছে বামফ্রন্টকে। এবার পঞ্চায়েত ভোটের মুখেও সেই নন্দীগ্রাম বিতর্ক আপনার ছায়াসঙ্গী হয়ে রইল। এই ভোটের প্রচারে নিশ্চয়ই আপনারা লোবায় কেন গুলি চলল সে প্রশ্ন তুলবেন। নিশ্চয়ই প্রশ্ন তুলবেন মঙ্গলকোটের ঘটনা নিয়ে। কিন্তু সেই সঙ্গে বাংলার সাম্প্রতিক রাজনীতিতে সব থেকে জঘন্য ঘটনা নন্দীগ্রামের গুলিচালনা প্রশ্নে চুপ করে থাকলে সেটা যে বড় দ্বিচারিতা হয়ে যাবে কমরেড।

— **সুন্দর মৌলিক**

ইতিহাস যেন মিথ্যার বেসাতি না হয়

দীনেশচন্দ্র সিংহ

উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে ইতিহাস বিষয়ে নতুন সিলেবাস রচনার তোড়জোড় শুরু হতেই বিশেষ মহল থেকে আশঙ্কা ও আপত্তি উঠতে শুরু হয়েছে। সেটাই স্বাভাবিক। এই আপত্তিকারীদের পৃষ্ঠপোষকগণ দীর্ঘ ৩৪ বছর ধরে প্রকৃত ইতিহাস চাপা দিয়ে অসত্য অর্ধসত্য ও মনগড়া কাহিনীকে ইতিহাস নামে ছাত্রদের গলাধঃকরণ করিয়েছে। ঘরের খাঁটি মালমশলা বর্জন করে বাইরের বাজে মালে ইতিহাসের পাতা ভরিয়েছে।

সেসব জঞ্জাল দূর করে সত্য ইতিহাস প্রকাশের আশঙ্কাতেই চেলাচামুণ্ডাদের হৃদ্‌কম্প শুরু হয়েছে।

প্রস্তাবিত নতুন ইতিহাস সিলেবাসে স্বাধীনোত্তর পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস তুলে ধরা হবে বলে শোনা যাচ্ছে। এখানেই মনে হচ্ছে বিসমিল্লায় গলদ ঘটবে। অখণ্ড বঙ্গদেশ থেকে খণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গে রূপান্তরের নিষ্করুণ কাহিনী এড়িয়ে কোনোমতেই পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস তৈরি হতে পারে না। কারণ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের বিধান মতে ১৯৩৭ সালে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয় বিধানসভার নির্বাচন থেকে ধাপে ধাপে এগিয়ে না এসে হঠাৎ ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট থেকে পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাস রচনা হবে পারম্পর্যহীন ও খাপছাড়া গোছের। সেক্ষেত্রে বাঙালী জীবনের বর্তমান দুর্দশা এবং হতচ্ছাড়া দশা সম্পর্কে নতুন প্রজন্মকে ওয়াকিবহাল করতে হলে অবিভক্ত বাংলার ১৯৩৭ সালের আইনসভার নির্বাচন থেকে ধাপে ধাপে নিম্নোক্ত রূপে এগোলেই প্রকৃত ইতিহাস রচিত হবে; নচেৎ নয়।

১. ১৯৩৭ সালের নির্বাচনের পর কংগ্রেস ও ফজলুল হকের কৃষক-প্রজা দলের কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব কে বা কারা ভেস্তে দিয়ে বাংলাকে সাম্প্রদায়িক মুসলিম লীগের হাতে তুলে দিয়েছিল তাদের পরিচয় ও কুচক্রের পরিণতি।

২. সুভাষচন্দ্র বসুকে কংগ্রেস থেকে বিতাড়নের কাণ্ডারীদের মুখোস উন্মোচন ও তার অশুভ পরিণতি।

২ক. মুসলিম লীগের লাহোর প্রস্তাব : দেশভাগ ও পাকিস্তান দাবি উত্থাপন : গান্ধীর মৌন সম্মতি : কম্যুনিস্টদের সোল্লাস সমর্থন : একমাত্র প্রতিবাদী হিন্দু মহাসভা ও ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি।

৩. দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতেই তড়িঘড়ি কংগ্রেসি মন্ত্রিসভাগুলিকে পদত্যাগ করিয়ে দেশটাকে পুরোপুরি বৃটিশ ও মুসলিম লীগের হাতে তুলে দিয়ে কোন মহৎ উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছিল? বৃটিশের মনোতুষ্টি ও সাম্প্রদায়িক শক্তির পরিপুষ্টি ছাড়া?

৪. সুভাষচন্দ্র দেশ থেকে পালিয়ে গেলে গান্ধী-কংগ্রেসীদের হরিষে বিষাদ : 'আমি সুভাষ বলছি' শুনে তাদের আক্কেলগুড়ুম অবস্থা।

৫. বাংলায় মুসলিম লীগ শাসনে হিন্দুদের চরম দুর্দশা : লীগ মন্ত্রিসভার পতনের পর শ্যামা-হক মন্ত্রিসভা গঠন করে বাংলায় হিন্দু-মুসলিম যৌথ শাসনের শেষ প্রচেষ্টা।

৬. যুদ্ধ ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত বাংলায় জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে বাঙালির চরম দুর্দশা। সৈন্য ও রসদ সংগ্রহে লীগ-কমিউনিস্ট যুক্ত প্রচার ও সহযোগিতা।

৭. ক্রীপস্ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যানের অর্বাচীনতা।

৮. যুদ্ধে প্রথমে বৃটিশ জাতির প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন : পরে তাদের চরম বিপদকালে ভারত ছাড়ো আন্দোলনের ডাক দিয়ে জেলে ঢুকে নেতাদের আরামে দিন যাপন : সাধারণ লোক মরল গুলি খেয়ে। সিঙ্গাপুর-রেঙ্গুনে নেতাজীর আবির্ভাব ও আজাদ হিন্দ্ ফৌজ গঠনে গান্ধীবাদীদের দিশাহারা অবস্থা।

৯. কম্যুনিস্টদের নেতাজী দূষণ। কুৎসিত-নিন্দা ও অভব্য গালমন্দের সঙ্গে নেহরুর পোঁ-ধরা। ভারতের মাটিতে আজাদ হিন্দ্ ফৌজ তথা ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন। জাপানের হাত থেকে

এই ইতিহাস পড়ানো হবে?

হিন্দু উদ্বাস্তু স্রোত। '৪৭-এর রক্তক্ষয়ী দাঙ্গার মর্মান্তিক স্মৃতি। (ফাইল চিত্র)

আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের (শহীদ ও স্বরাজ-দ্বীপপুঞ্জ নামকরণ) শাসনভার গ্রহণ।

১০. বিশ্বযুদ্ধ শেষ। নেতাজীর পুনরায় অন্তর্ধান। প্লেন দুর্ঘটনার মিথ্যা প্রচার। নেহরুর ডিগবাজী। আই. এন. এ.-র 'জয়হিন্দ' স্লোগান চুরি করে ও লালকেল্লায় ব্যারিস্টারের আলখাল্লা গায়ে চড়িয়ে জনগণকে ধোঁকা দিয়ে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বাজিমাত। নেতাজীকে মৃত প্রমাণ করতে আদাজল খেয়ে লাগা।

১১. সিমলা বৈঠক : ওয়াভেল পরিকল্পনা : পাকিস্তানের পক্ষে কম্যুনিস্টদের সওয়াল : গান্ধী-জিন্না বৈঠক : শ্যামাপ্রসাদের এই বৈঠকে আপত্তি : মুসলমান সমাজে জিন্নার মর্যাদা বৃদ্ধি।

১২. ১৯৪৬-এর নির্বাচন : মুসলমানদের একচ্ছত্র নেতা হিসাবে জিন্নার স্বীকৃতি : অখণ্ড ভারতের মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে গান্ধী ও কংগ্রেসীরা হিন্দুদের বোকা বানিয়ে জিতে গেল এবং অনতিবিলম্বে বুঝতে পারল তারা জেনেশুনে বিষ পান করেছে, নিজেদের পায়ে নিজে কুড়াল মেরেছে।

১৩. ১৯৪৬-এর প্রত্যক্ষ সংগ্রাম তথা হিন্দুবিরোধী দাঙ্গা : প্রথমে কলকাতা পরে নোয়াখালি : পরে সারা দেশব্যাপী : দাঙ্গায় বিশেষ বিশেষ ব্যক্তি ও রাজনৈতিক দলের ভূমিকা : দেশভাগের দাবি জোরদার : প্রতিবাদে প্রদেশ ভাগের দাবি উত্থাপন : প্রদেশ ভাগ বানচাল করতে স্বাধীন যুক্তবঙ্গের চালাকি : ফাঁদে শরৎ বসু ও আরও ক'জন : যুক্তবঙ্গের নামে সম্পূর্ণ বঙ্গ পাকিস্তানে ঢোকাবার শয়তানি কৌশল ধূলিসাৎ করে ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ও আরও কয়েকজনের আপ্রাণ চেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গ নামে ভূমিখণ্ডটুকু পাকিস্তানের কবল থেকে রক্ষা।

১৪. দেশ ভাগ হলো : প্রদেশ এমন কি জেলাতে ভাগ হলো : লক্ষ লক্ষ লোকের সোনার সংসার ছাই হলো : হাজার হাজার নরনারী শিশুর দেহ খণ্ডিত হলো : গান্ধীর দেহ অখণ্ড রইল : বাঙালি হিন্দু রিফিউজী নামে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল : তার আর ফিরে দাঁড়াবার উপায় রইল না।

সুতরাং ১৯৩২ সালের ১৭ আগস্ট Communal Award বা সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মাধ্যমে বাঙালী হিন্দুকে কোণঠাসা করার যে ছক কষা হয়েছিল, ১৫ বছর পরে ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট দিল্লীতে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেনের হাতে তাতে পূর্ণচ্ছেদ পড়ল। 'দেশভাগের জন্য মাউন্টব্যাটেন দায়ী নয়'—গান্ধীর নিকট থেকে এই সার্টিফিকেট নিয়ে শেষ ভাইসরয় ও প্রথম গভর্নর জেনারেল হৃষ্টমনে স্বদেশে পাড়ি দিলেন। পেছনে রেখে গেলেন রক্তস্নাত, অশ্রুসিক্ত বিকলাঙ্গ ভারতমাতাকে।

প্রস্তাবিত ইতিহাস সিলেবাসে এসব ঘটনাবলী যথাযথ স্থান না পেলে তা ইতিহাস সংস্কার না হয়ে হবে ইতিহাসের সৎকার—কম্যুনিস্টদের মতোই।

Sharada Travels

ভ্রমণ পিপাসু বাঙালীর নির্ভরযোগ্য সঙ্গী

শারদা ট্রাভেলস্

ফুলেশ্বর, উলুবেড়িয়া, হাওড়া

প্রত্যুষ মন্ডল — 9874398337

গ্রীষ্মকালীন ভ্রমনসূচী-২০১৩

ভ্রমণ	দিন	শুভ যাত্রা	প্যাকেজ মূল্য		
			প্রাপ্তবয়স্ক	বালক/বালিকা ৫-১১ বৎসর	শিশু ২-৪ বৎসর
উত্তর ভারত (দেরাদুন-মুসৌরী-হরিদ্বার-দিল্লি-মথুরা-বৃন্দাবন-আগ্রা)	১২	১৫ই মার্চ,২০১৩	৯,৮০০/-	৭,৫০০/-	২,৫০০/-
কাশ্মীর (অমৃতসর ও বৈষ্ণোদেবী সহ)	১২	২৮শে মার্চ,২০১৩	৯,৮০০/-	৭,৫০০/-	২,৫০০/-
গ্যাংটক-নামচি-পেলিং	৮	১৭ই এপ্রিল,২০১৩ ২২শে মে,২০১৩	৭,০০০/-	৫,৫০০/-	২,০০০/-
দার্জিলিং-গ্যাংটক	৮	২৩শে মে,২০১৩	৬,৮০০/-	৫,১০০/-	১,৭০০/-
সিমলা-কুলু-মানালী	১১	৯ই মে,২০১৩	৯,৫০০/-	৭,৩০০/-	২,৪০০/-

ট্রেনের টিকিট নিশ্চিত করতে অবশ্যই যাত্রা শুরুর চার মাস আগে যোগাযোগ করুন অথবা ডাকুন।

প্যাকেজে থাকছে :- ট্রেন/লাক্সারী বাস/ছোট গাড়ীতে যাতায়াত, সাইড সিইং, সকালে চা টিফিন, লাঞ্চ, ডিনার (আমিষ/নিরামিষ), টোল ট্যাক্স,গাড়ী পার্কিং।

প্যাকেজে থাকছে না :- এন্ট্রি ফি, কুলী ভাড়া, ক্যামেরা চার্জ, নৌকাবিহার, রোপওয়ে, হাতি/ঘোড়া চাপা, পূজো দেওয়া, ব্যক্তিগত ব্যবহারের গাড়ি ভাড়া।

স্কুল, কলেজে ও গ্রুপ টুরের জন্য যোগাযোগ করুন।

কল্যাণ আশ্রমের কার্যকর্তাদের ‘জনজাতি সমাগম’

উজ্জয়িনীতে ঐতিহাসিক ‘বনবাসী কুম্ভ’

অরুণ ভট্টাচার্য

অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রম প্রতিষ্ঠার ৬০ বৎসর পূর্তি উপলক্ষে মহাকালের নগর মন্দিরময় উজ্জয়িনীতে ২৪-২৬ ডিসেম্বর, ২০১২-তে অনুষ্ঠিত হলো বিশাল ‘জনজাতি সমাগম’। স্থানীয় অ্যালপাইন ইনস্টিটিউট অফ টেকনলজির কয়েক একর জমি ও কলেজ বিল্ডিং জুড়ে কল্যাণ আশ্রমের প্রায় ৩,০০০ প্রতিনিধি এবং শতাধিক স্বেচ্ছাসেবীর থাকা-খাওয়া, প্রদর্শনী, সভাস্থল, স্টল এবং আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত সুচারু ও সুশৃঙ্খল। বনবাসীদের এই বিশাল সম্মেলন সংবাদপত্র সমূহে আখ্যা পেয়েছিল ‘বনবাসী মহাকুম্ভ’। বারো বছর অন্তর মহাকুম্ভের অনুষ্ঠান হয় এই উজ্জয়িনীতে। এই জনজাতি সমাগমে ভগবান শ্রীরামের চিত্রের সামনে দীপ প্রজ্জ্বলিত করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন অনুষ্ঠানের মুখ্য অতিথি স্বামী গোবিন্দদেব গিরি, বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের রাষ্ট্রীয় অধ্যক্ষ জগদেবরাম ওরাঁও, অরুণাচলের বৌদ্ধ ধর্মগুরু তাওয়াং মঠের তুলকু রিম্পোচে এবং আরও অনেকে।

উজ্জয়িনীতে ‘জনজাতি সমাগম’ মঞ্চে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ।

“সত্যসংকল্প থাকলে সংকটে অটল থেকে ব্যক্তি, সমাজ ও সৃষ্টির রক্ষাকার্য সম্ভব। বীজকে লালন-পালন করলে বহু বীজ সৃষ্টিকারক বৃক্ষ হবে। ৬০ বছরে কল্যাণ আশ্রমরূপী বটবৃক্ষ বহু বিস্তৃত। শতবর্ষের পূর্বে সমগ্র ভারত সমসূত্রে গ্রথিত সর্বকল্যাণ কামীরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।”

কার্যক্রমের সূচনায় শ্রী ওরাঁও বলেন, ভারতে ১০ কোটির বেশি (বর্তমানে প্রায় ১২ কোটি) জনজাতির প্রায় ৭০০টি উপজাতি বসবাস করেন। সারা দেশে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার গ্রামে তাঁদের বিস্তার। বনবাসী সমাজে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, স্বাবলম্বন, আর্থিক প্রকল্প সহ তাঁদের মধ্যে রাষ্ট্রীয় একাত্ম ভাব স্থাপনের কাজে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম নিয়োজিত। ভারতে অতি প্রাচীনকাল থেকেই বনবাসী সমাজ ছিল অত্যন্ত সৎ, সরল, দেশপ্রাণ, সুসংবদ্ধ এবং ধার্মিক। রামায়ণ-মহাভারত ও অন্যান্য পুরাণেতিহাসে আমরা তাঁদের উন্নত সংস্কৃতির পরিচয় পাই। সুর-নর-কিন্নর-গন্ধর্ব সকলেই মানুষ। কেবলমাত্র আচরণেই বৈচিত্র্য, রুক্মিণী তো অরণ্যপুত্রী। ভীম-অর্জুনাদির পত্নীও অরণ্যবাসী। আজও মণিপুরে গোবিন্দজীর পূজা সম্পন্ন হয় না নাগাদের নৃত্যানুষ্ঠান না হলে। আজও ‘জগন্নাথকা ভাত’ কোনও জাত-পাত না মেনেই সকলের প্রসাদ, মহাপ্রসাদ রূপে গ্রাহ্য। বিষম পরিস্থিতির মধ্যে থেকেও বনবাসীরা ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদকে নিজেদের জীবন-যাপনের আধার রূপে গ্রহণ করেছেন। প্রকৃতিকে ধ্বংস নয় পালন, পূজার মাধ্যমে বনবাসীরা প্রকৃতিকে আত্মস্থ করেছেন। কল্যাণ আশ্রম বনবাসীদের কল্যাণের অনুরূপ পরামর্শ সময় সময় সরকারকে দিয়ে আসছে, বহু প্রকল্পও চালিয়ে আসছে।

পুণের পরমপূজ্য স্বামী গোবিন্দ গিরি মহারাজের শুভারম্ভ ভাষণের পূর্বে ‘শ্রীরাম জয়রাম, জয় জয় রাম’ মন্ত্রে শ্রীরামের জয়-জয়কারের মাধ্যমে জনজাতি সমাগমের সভাগারকে তিনি রামময় করে তোলেন। তিনি বলেন, পবিত্র এই মন্দিরময়ী তীর্থে জনজাতির জনসমাগম কুম্ভকে দেখতে

ভারতমাতা এতদিন অপেক্ষা করছিলেন। যে স্বপ্ন স্বামী বিবেকানন্দ, ডাক্তারজী, সাভারকর দেখেছিলেন, তার বাস্তব রূপকে আজ আমি অভিনন্দিত করছি। বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের মূল স্থপতি স্বর্গত বালাসাহেব দেশপাণ্ডেকে শ্রদ্ধা নিবেদন করি। তিনি ছিলেন প্রন্যাসী— অন্তরে সন্ন্যাসী, অথচ সন্ন্যাসীর গরিমা ছেড়েছেন প্রন্যাসী দেশপাণ্ডে। আশ্রমের ত্যাগব্রতীদের কাজকে সকলে দেখবে কোহিনুরের মতো পরম মূল্যবান মণিরূপে। বনবাসীর সেবা হলো ভারতমাতার পীড়া দূর করা। স্বামী বিবেকানন্দের ভাষায়— ভারতমাতা জেগে উঠছেন দরিদ্রের পর্ণকুটির থেকে, কামার-কুমোর, মেথর-মুচির ঘর থেকে। আমি বলি, বনবাসী সমাজ আজ জেগে উঠছে, ভারতমাতা জেগে উঠছেন। সারা বিশ্ব ভারতচরণে প্রণতি জানাতে চলেছে। শ্রীরাম বনবাসীদের বুকে তুলে নিয়েছেন। বেদব্যাস, বাল্মীকি আদর্শ বনবাসী; সারা বিশ্বকে তাঁদের জ্ঞানের পরম বিভূতিকে তুলে ধরেছেন। সকলকে আবাহন করি সমর্পণের জন্য— সময়, অর্থ, ক্ষমতা দান করুন। বনবাসী সমাজই সনাতন সংস্কৃতির বাস্তবিক সংবাহক।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে লোকসভার উপসভাপতি শ্রী কারিয়া মুণ্ডার সভাপতির ভাষণ দেওয়ার কথা থাকলেও বিশেষ কারণে তিনি যোগ দিতে না পারায় তাঁর লিখিত ভাষণ পাঠ করা হয়।

তিন দিনের সম্মেলনে মুখ্য গণগীত— 'জন্মভূমি হ্যায় কর্মভূমি ইহ, পুণ্যধরা সুরধাম হ্যায় / গর্ব হমে হ্যায় ইস ধরতীপর, হম সহে সন্তান হ্যায়।'

মাতৃহস্তে পরিবার ভোজন

বনবাসী-নগরবাসীদের মেলবন্ধনের এক অভূতপূর্ব প্রয়াস বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের। ২৫ ডিসেম্বর উজ্জয়িনী নগরের আট শতাধিক পরিবার বনবাসী জনসমাগমের তিন সহস্রাধিক প্রতিনিধিকে ভোজন করালেন। নগরবাসীরা সপরিবারে জনজাতি কুম্ভ পরিসরে হাজির হলেন। প্রতিটি পরিবার ৩-৪ জনের রাত্রি আহার সামগ্রী বাড়ি থেকে তৈরি করে আনলেন। তার সঙ্গে নিজেদের খাবারও। বনবাসীদের সঙ্গে শুরু হলো প্রাথমিক আলাপ-পর্ব। একে অপরকে জানেন না, চেনেন না। ভাষা, পোষাক, আদব-কায়দা সবই আলাদা। উত্তরে হিমাচলপ্রদেশ থেকে দক্ষিণে কেরালা-তামিলনাড়ু, পশ্চিমে গুজরাত- রাজস্থান থেকে পূর্বে অরুণাচল-ত্রিপুরা থেকে আগত বনবাসী। শহুরে পরিবার, শহুরে আদব-কায়দা কোথাও বাধা হয়ে দাঁড়াল না। এক সঙ্গে চলল ভোজন। ঠিকানার আদান-প্রদান। দু' ঘণ্টার ভোজন-মেলার শেষে পেট ভরপুর, মন ভরপুর অথচ প্রত্যেকের মন ভারী হয়ে উঠল আসন্ন বিচ্ছেদের জন্য। দু' ঘণ্টার মিলনমেলা অথচ যেন কত দিনের আন্তর-যোগ! চোখের পাতাও কি ভারী হলো নাকি!

বনবাসী জীবন-শৈলীর প্রদর্শনী

বনবাসী জনজাতিদের পরম্পরা, বেশভূষা, লোকনৃত্য, সামাজিক অনুষ্ঠান, দৈনন্দিন ঘর-গৃহস্থালির কাজ, পারিবারিক অনুষ্ঠান, আবাস, দৈনন্দিন জীবিকার বিভিন্ন চিত্র নিয়ে দু'টি প্রদর্শনী মঞ্চ সকলের দৃষ্টি আকর্ষণই নয়, বনাঞ্চলের ঝলকে খণ্ড খণ্ড চিত্র পূর্ণ ভারতকে তুলে

অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রম
এক নজরে প্রকল্পগুলির খতিয়ান

১। হোস্টেল	বালক-১৭৮	
	বালিকা-৪৪	
২। ছাত্রছাত্রী	বালক-৬০৩৮	
	বালিকা-১৫৫০	
৩। শিক্ষা কেন্দ্র		
(ক)	উচ্চ বিদ্যালয়	৪৮
(খ)	প্রাথমিক বিদ্যালয়	১৯১
(গ)	প্রাক্-প্রাথমিক বিদ্যালয়	৬৯
(ঘ)	একল বিদ্যালয়	১৩২৮
(ঙ)	বালওয়াড়ি (বিদ্যামন্দির)	৫৫৩
(চ)	বাল সংস্কার কেন্দ্র (দৈনিক)	৪৫৭
(ছ)	বাল সংস্কার কেন্দ্র (সাপ্তাহিক)	৫০৯
(জ)	রাত্রিস্কুল	১৭৪
(ঝ)	নিঃশুল্ক কোচিং ক্লাস	৪১৫
(ঞ)	লাইব্রেরি ও রিডিং-রুম	৫০
	উপকৃতদের সংখ্যা	১০৭৭৮০
৪। অর্থনৈতিক উন্নয়ন		
(ক)	কৃষি উন্নয়ন কেন্দ্র	৮২
	উপকৃত	২৬৩০
(খ)	ভোকেশনাল ট্রেনিং সেন্টার	৭৯
	উপকৃত	৯০৫
(গ)	স্বনিযুক্তি গোষ্ঠী-স্থান	১১৬৫
	গোষ্ঠী	২০৬৩
	উপকৃত	৩০৫০৪
(ঘ)	গ্রামবিকাশ	৯৯
	উপকৃত	৮০৪০
(ঙ)	অন্যান্য	৩১
	উপকৃত	৪৭৫০
৫। চিকিৎসা		
(ক)	প্রত্যহ	৩৫
(খ)	সাপ্তাহিক	৩৮৭
(গ)	আরোগ্য রক্ষক	২৭০৯
(ঘ)	হাসপাতাল	৩
(ঙ)	মেডিকেল ক্যাম্প	৫১৭
	উপকৃত	৭৫৪৪৩৭
৬। খেলখুদ (খেলা) কেন্দ্র-দৈনিক		৯১০
(সাপ্তাহিক)		১৬৬৮
৭। শ্রদ্ধা জাগরণ (সৎসঙ্গ)		৫৬০৩
অন্যান্য		৩৫
মোট প্রকল্প		১৭৭২১
মোট প্রকল্প (স্থান)		১২৩২৪
লোককলা		৫১১

ধরেছে। সেই সঙ্গে বনবাসী ধর্মগুরু ও মহাপুরুষদের চিত্রও স্থান পেয়েছে প্রদর্শনীতে। বনবাসী গ্রামগুলিতে বিভিন্ন প্রকল্পে কাজ চলছে। সেগুলিরও এক সংক্ষিপ্ত রূপ উপস্থাপিত।

আসতে লাগল পাঁচ দিন

জনজাতি সমাগমে ভারতের সুদূরবর্তী বনাঞ্চল অরুণাচলের চীন সীমান্ত এলাকা থেকে যাঁরা উজ্জয়িনীতে যোগ দিতে এলেন তাঁদের আসতেই লেগে গেল পাঁচ দিন। পূর্ব

জনজাতি গোষ্ঠীর এক পূজার অনুষ্ঠান।

কোমাং জেলার ধুমকে তেংচি, মেচুকার যাপী যোনীং, তনু লোহিতের বন্দালু, অজিব্সী পুলের ন্যায় প্রতিনিধিদের বক্তব্য অন্তত তাই। নিজেদের গ্রাম থেকে অসমের তিনসুকিয়া আসতেই কম-বেশি দেড় দিন, সেখান থেকে গৌহাটি একদিন পুরো এবং গৌহাটি থেকে উজ্জয়িনী দুই দিন। অরুণাচলের প্রতিনিধিদের এমন কয়েকজন ছিলেন যাঁরা জীবনে প্রথম সচক্ষে দেখলেন রেলগাড়ি এবং চড়লেনও।

আন্দামান থেকে আগত বনবাসীদের জাহাজে করে জলপথে কলকাতা হয়ে আসতেও তার চেয়ে কম দিন লাগেনি।

রঙ-বেরঙে সজ্জিত বনবাসীদের শোভাযাত্রা

২৬ ডিসেম্বর বেলা ১২টায় মহাকাল মন্দির লাগোয়া ময়দান থেকে বের হলো নানা রঙের সহ-পোষাকে সজ্জিত বনবাসীদের শোভাযাত্রা। পথে পটনী বাজার, গোপাল মন্দির, কাঁঠাল চৌরাহা, নই সড়ক, দৌলতগঞ্জ, মালিপুরা, দেবাস গেট, চামুণ্ডা মাতা চৌরাহা হয়ে সামাজিক ন্যায় পরিসরে শোভাযাত্রা সমাপ্ত হয়। অন্যান্য প্রদেশের প্রতিনিধিদের সঙ্গে যোগ দেন স্থানীয় মালওয়া ও নিমাড়ের কয়েক হাজার জনজাতি। বনবাসীরা নিজেদের বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে নৃত্য-গীত করতে করতে পথ চলেন। স্থানে স্থানে পুষ্পবর্ষণ দ্বারা (কোথাও মঞ্চ থেকে পুষ্পবর্ষণ করে) বনবাসীদের সংবর্ধনা জানানো হয়। মোট ২০টি স্বাগত মঞ্চ প্রস্তুত করা হয়।

শোভাযাত্রা শুরু হওয়ার পূর্বে মহাকালপুরমের নিকটে সরস্বতী শিশু মন্দিরে স্বাগত সমিতির দ্বারা সকলের জন্য ভোজন ব্যবস্থা ছিল। প্রায় ৮,০০০ বন্ধুকে ভোজন পরিবেশন করা হয়।

সাংস্কৃতিক কার্যক্রম

প্রতি দিন রাত্রে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের জনগোষ্ঠির নৃত্য, গীত ও বাদ্যযন্ত্রের কলাকৃতি উপস্থাপনার বৈচিত্র্য সকলের মনোরঞ্জন করে। শীতের মধ্যেও শিল্পীদের উৎসাহ ও পরিবেশন নৈপুণ্যের গুণে ঠাণ্ডা দর্শকদের কাবু করতে পারেনি। অসম, ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল, মণিপুর, কেরল, ঝাড়খণ্ড, রাজস্থান, গুজরাত প্রভৃতি প্রান্তের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ অনুষ্ঠান সকলকে মোহিত করে।

জনজাতি গোষ্ঠীর পূজানুষ্ঠান

২৫ ডিসেম্বর সকালে বিভিন্ন প্রান্তের জনজাতি গোষ্ঠীর পুরোহিতেরা নব নির্মিত আলাদা আলাদা প্রকোষ্ঠে পূজা উপকরণ দিয়ে নিজেদের পূজানুষ্ঠান সম্পন্ন করেন। সেই সঙ্গে চলল নিজেদের নাচ-গান। পূজা উপকরণে বিভিন্ন গাছের পূজা, প্রস্তর পূজা, কোথাও মুরগী বলি, কোথাও ডিম, নিজ নিজ ভাষায় মন্ত্রপাঠ, শারীরিক কসরত প্রদর্শন চলল ২/৩ ঘণ্টা জুড়ে। কোথাও কোথাও জনজাতি গোষ্ঠীর নাচের তালে তালে নগরবাসী ছেলে-মেয়েরাও যোগ দিয়ে একাকার হয়ে গেলেন।

২৮০০ জনের মধ্যে ৪৭ ইঞ্জিনিয়ার

তামিলনাড়ুর নীলগিরি পাহাড়ী এলাকার জঙ্গলে 'কোতর' জনজাতির বাস। বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের প্রচারক কৌশল্যা রবীন্দ্রের কথায়, কোতরা জনজাতির বৈশিষ্ট্য এক ঐতিহ্যপূর্ণ। তাঁরা শিব-পার্বতীর পূজক, অত্যন্ত ধর্মনিষ্ঠ। পোড়তে (সূর্য) এবং মারীন পোড়তে (চন্দ্রমা)-র স্থানও তাঁদের ধর্মে অতি উচ্চে। কোতর জনজাতির মহিলারা পুরুষদের সঙ্গে একত্রে নৃত্য করেন না। তাঁদের স্বধর্মপ্রীতি এত গভীর যে, তাঁদের মধ্যে এক জনও ধর্মান্তরিত হননি। তাঁদের মোট জনসংখ্যা ২,৮০০। এর মধ্যে ৪৭ জন ইঞ্জিনিয়ার এবং ২ জন আই. এ. এস. আধিকারিক।

প্রত্যেকে নিজ ধর্মের জন্য গর্বিত, নিজেদের হিন্দু ধর্মের অন্তর্গত বলতেও গর্বিত।

মধ্যপ্রদেশে বিনা আবেদন পত্রে ধর্মান্তরণে কঠোর শাস্তি : শিবরাজ সিংহ চৌহান, মুখ্যমন্ত্রী

২৬ ডিসেম্বর, ১৯১২। অখিল ভারতীয় বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের ৬০ বর্ষ পূর্তি সমারোহ কার্যকর্তা সম্মেলনের তিন দিবসীয় সমারোহে সভাপতির ভাষণে মধ্যপ্রদেশ সরকারের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শিবরাজ সিংহ চৌহান বলেন, ধর্মের অপহরণ বরদাস্ত করা হবে না। বনবাসীদের ধর্মান্তরণ যদি কোনও আবেদন পত্র ব্যতিরেকে করা হয় তাহলে ধর্ম অপহারকের শাস্তি কারাবাস। বনবাসীদের কল্যাণে রাজ্য সরকার বহু কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। বিনা লাইসেন্সে কোনও সাহুকর (সুদের কারবারী) কোনও ধার দিতে পারবে না। প্রায় পৌনে দু লাখ বনবাসীকে বন অধিকার পাট্টা বিতরণ করা হয়েছে। এই কাজ নিরন্তর জারি করা হয়েছে। বনবাসীদের বনজ উৎপাদন সরকার সমর্থন মূল্যে খরিদ করার ব্যবস্থা করেছে। উচ্চ-শিক্ষার্থী বনবাসী ছাত্র শিক্ষা লাভের জন্য বিদেশে যেতে চাইলে সরকার থেকে ভরপুর সাহায্য করবে।

শ্রীচৌহান বলেন— 'হম ভারতকে লাল কহাঁ করে ভেদভাব।' বনবাসীরা ভারতীয় সংস্কৃতির রক্ষক। বনবাসীদের মধ্যে রয়েছে অপার ক্ষমতা, তাঁদের প্রয়োজন সুযোগগুলিকে কাজে লাগান। কল্যাণ আশ্রমের বীজ ১৯৫২ সালে বালাসাহেব দেশপাণ্ডে ছত্রিশগড়ের জশপুর নগরে প্রোথিত করেন, আজ তা এক বিশাল বটবৃক্ষে পরিণত। তাঁর বিশাল কর্মোদ্যোগের জন্যই আজ আমরা স্বাগত জানাতে পেরেছি জনজাতি কুম্ভকে। এজন্য আমরা গর্বিত, ধন্য।

বনবাসীরা সর্বদা দেশের মঙ্গলের জন্য কাজ করে চলেছেন। তাঁত্যা ভীল এক অসাধারণ উদাহরণ।

বনবাসীদের উৎখাত আমাদের সরকারি নীতি নয়। ব্যাঘ্র সংরক্ষণের জন্যও বনবাসী উৎখাত নয়। যাঁরা যেখানে আছেন, তাঁরা সেখানেই শান্তির সঙ্গে, গর্বের সঙ্গে থাকুন। আজও কোনও বনবাসীর আত্মহত্যার উদাহরণ নেই--- এমনই তাঁদের আত্মনির্ভরতা। তাঁরা নমস্য।

বনবাসীদের হিতরক্ষাই আমাদের কর্তব্য মোহনরাও ভাগবত, সরসঙ্ঘচালক, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ

কল্যাণের কাজ বনবাসী কল্যাণ আশ্রমের। যে কল্যাণ সত্য আধারিত তা সকলের জন্য উপযুক্ত, সর্বকালের জন্য। বনবাসীদের জন্য কাজ করে চলেছে কল্যাণ আশ্রম। পূর্বে বনেই কৃষিকাজ হোত। বনবাসী ও কৃষকদের সম্পর্ক সেই সুদূর অতীত থেকে। স্ব-পরিচয়ে দাঁড়াতে পারলে আত্মবিকাশ সম্ভব। এ প্রসঙ্গে স্বামীজির বলা গল্প উল্লেখ করা যায়। বাঘের ছানা ছাগলের পালে বড় হয়ে তাদের মতো ভীরু, তাদের মতো ধাক্কা-ধাক্কি, মালিকের লাঠি খাওয়া শিখেছে। পরে পালে বাঘ পড়লে সেই শিশুবাঘও পালাতে থাকে। শেষে বাঘ তাকে ধরে পুকুর পাড়ে নিয়ে গিয়ে তার প্রতিবিম্ব দেখিয়ে স্ব-পরিচয়ে এনে দেয়। ভারতবাসীরাও আজ পথ ভুলতে বসেছে। ভারতের পরিচয় তার বিবিধতার মধ্যে একতা, উপভোগ নয় ত্যাগ, সকলের প্রতি কৃতজ্ঞতা। এর বিপরীত চিত্র দেখি পাশ্চাত্যে, আমেরিকার বিকাশ, বৈভব অসীম অথচ শিশুর সহপাঠী হত্যা, মাতৃহত্যা কেন? আমেরিকার অধিকাংশ লোক ভারতের দিকে তাকিয়ে, তাদের চার্চে যাওয়া প্রায় বন্ধ। বাস্তবে সুখ কোথায়? রসগোল্লা খাওয়ায় সুখ। বেশি খেলে শেষে বমি, বিতৃষ্ণা। তাই সুখ বাহ্যিক নয়, অন্তরের হওয়া চাই। ভারতীয়রা বিশ্ব চরাচরকে জানার পর শুরু করে তার আন্তর-চিন্তা। শেষে সমাধান, শান্তি। লাভ হলো জীবন-পথ প্রাপ্তি। ছান্দোগ্য উপনিষদে বিরোচন ও ইন্দ্র প্রসঙ্গ আছে। দানব ও দেবতার বিরোধের কথা—আত্মতত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য উভয়েই ব্রহ্মার নিকট গেছেন। নিজ নিজ বিচারধারায় বিরোচন অসম্পূর্ণ শিক্ষা লাভ করে দেহতত্ত্বেই আবদ্ধ হন, আর ইন্দ্র লাভ করেন শাশ্বত সুখ, চিরন্তন সত্যের পথ। স্বয়ং মঙ্গল কর, সকলের মঙ্গল কর।

সুবনসিরি জেলার টাগিন জনজাতিদের পূজা অনুষ্ঠান।

এখনও বিশ্বে আসুরিক শক্তি শান্তির নামে রক্তপ্রবাহ সৃষ্টি করছে। বিশ্ব তাই পথের খোঁজে নেমেছে। কেনিয়ার নাইরোবিতে ইসলাম-পূর্ব এবং খৃস্টপূর্ব সময়কালের মানুষদের নিয়ে চর্চা করতে এক গোষ্ঠী কাজ করছে। খৃস্টান ও ইসলামের ধাক্কায় বিশ্বের প্রাচীন সম্প্রদায় নিশ্চিহ্ন হতে হতে এখন প্রায় ৩০টি দেশে 'ইন্ডিজেনাস ফেথ' নামে পরিচিত। ভারতের জনজাতিদেরও অনুরূপ গোষ্ঠিবদ্ধ করার চক্রান্ত চলছে।

আমাদের পরম্পরায় ঈশ্বর সর্বত্র, দেখার জন্য চেষ্টা চাই। অন্য ধর্মে ঈশ্বর দর্শনের জন্য

চাই কোনও মাধ্যম— কোনও ঈশ্বরপুত্রের বা ঈশ্বরবান্ধবের। রমন মহর্ষির কথায় পঞ্চ মহাভূত, সূর্য-চন্দ্র, জীবধারী সকলেই পূজার্হ। সত্যের পূজার মাধ্যমে মানবোত্থান কার্য করা চাই। এর মাধ্যমে হবে বনবাসীদের, কৃষকদের উন্নতি। কল্যাণ আশ্রম এই কাজ করতে নেমেছে। এই কাজে চাই কুশলতা এবং যোগ্যতা। ঈশ্বরীয় কার্য মনে করে যথাসময়ে যথাকার্য করা চাই। সব কাজের লক্ষ্য সত্যম্ শিবম্ সুন্দরমের পূজা। সত্যসংকল্প থাকলে সংকটে অটল থেকে ব্যক্তি, সমাজ ও সৃষ্টির রক্ষাকার্য সম্ভব। বীজকে লালন-পালন করলে বহু বীজ সৃষ্টিকারক বৃক্ষ হবে। ৬০ বছরে কল্যাণ আশ্রমরূপী বটবৃক্ষ বহু বিস্তৃত। শতবর্ষের পূর্বে সমগ্র ভারত সমসূত্রে গ্রথিত সর্বকল্যাণ কামীরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে।

(২৫.১২.২০১২ তারিখে প্রদত্ত ভাষণ)

অংশগ্রহণকারী জনজাতিদের কয়েকজন প্রতিনিধি।

কথা নয়, কাজে নামাই আসল কথা

এখন সময় এসে গেছে বনবাসীদের হিতরক্ষার জন্য আমাদের সকলকে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে একযোগে কাজে নামার। জনজাতিকে মুখ্য ধারার সঙ্গে এনে মেলাতে হবে তা নয়, তাঁরা তো আমাদের সংস্কৃতির অঙ্গ। বনবাসীদের সেবা নয়, কর্তব্য আমাদের তাঁদের কাছে পৌঁছানোর। ভাই ভাইকে সেবা করে না ভাই ভায়ের প্রতি কর্তব্য পালন করে। আমরা আমাদের কর্তব্য ভুলে গিয়েছি বলেই বনবাসীরা আজ দুর্দশাগ্রস্ত। তাদের দাবী আমাদের প্রেম-ভালবাসার। বহু সময়ে দেখা গেছে বৈদেশিক আক্রমণে পর্যুদস্ত হয়ে দলে দলে ভারতীয় বীরেরা বনে আশ্রয় নিয়েছেন। বনবাসীদের দেশ-সমাজ-ধর্ম বোঝাতে হবে না। তাঁদের নিকটই রয়েছে দেশের প্রকৃত সম্পদ। বনবাসীদের ত্যাগ করে নয়, সঙ্গে করে নিয়ে চললে তবেই হবে দেশের সর্বাঙ্গীণ বিকাশ। তাঁদের প্রতি উপেক্ষা করার পাপ আমাদেরই প্রক্ষালন করতে হবে। ঝাড়খণ্ডের এক বৃদ্ধ বনবাসী মুখিয়া বললেন, তোমরা আমাদের ম্যালেরিয়ার ওষুধ আর শিক্ষা দেওয়ার জন্য লোক পাঠাও, বাকি দেশ, সমাজ-সংস্কৃতির ব্যাপারটা আমরাই বুঝে নেব। আজ বিশ্বে চলছে প্রকৃতি-নাশক এবং প্রকৃতি-পোষকের যুদ্ধ। আজ সমগ্র বিশ্ব জীবন নির্ভর করছে ভারতের প্রাচীন বিচারধারার উপর। আবার ভারতের মধ্যে প্রকৃত ভারতকে খুঁজে বের করতে হবে। অনেক সময় প্রশ্ন দেখা দেয় ভারতের মধ্যে সত্যিই ভারত আছে কি না। আজকের শিশু, বালকেরা অনেকে ভগবান রামের কথা জানে না, তাদেরকে রামের পরিচয় দিতে হয়। হনুমানের পরিচয় 'মাংকি গড অফ ইন্ডিয়া'। যার মধ্যে স্ব-গৌরব এবং স্ব-পরিচয় নেই সে তার সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, ইতিহাস সম্পর্কে গর্ববোধ করতে পারে না। স্বাধীনতা লাভের ৬৫ বছরের মধ্যেই আমরা আমাদের 'স্ব'-কে ভুলতে বসেছি। আমরা যেমন দেশটিকে পেতে চাই, তেমনটি তো হলো না। উন্নতির সকল যোজনা, প্রকল্প আর প্রয়াস সবই নকল করা, অন্য দেশের নকল। সেই নকল ভালো বা মঙ্গল করলে নকলে দোষ নেই। কুফল না হলেই হলো।

আমরা আজ স্বামী বিবেকানন্দের দিকে তাকিয়ে আছি। তাঁর প্রদর্শিত পথে চললে আমরা দেখতে পাব স্বামীজীর স্বপ্নের 'নতুন ভারতকে'। নতুন ভারত জেগে উঠবে জেলে, কুমোর, মেথর, মুচি, চণ্ডাল, বনবাসীর কুটির থেকে।

মহামণ্ডলেশ্বর স্বামী অখিলেশ্বরানন্দ গিরি (সমন্বয় সেবাকেন্দ্র, জবলপুর) তাঁর আশীর্বচনে বলেন, বনবাসী সমাজ পরম্পরাগত বিশ্বাসের অনুগমন করে চলেছে। ভারতের অখণ্ডতা ও স্বাধীনতা বনবাসী সমাজকে ছাড়া কল্পনাই করা যায় না। বনবাসী কার্যকর্তাদের নিকট স্বামীজির আহ্বান— বনবাসীদের মধ্যে নিরন্তর সেবা ও স্বাবলম্বনের অভিযান চালিয়ে যান। বনবাসীরা হাজার কষ্টের মধ্যে থাকলেও তাঁরা নিজেদের এলাকা ছেড়ে অন্যত্র যেতে চান না। পাতালকোটের ধসে সম্পূর্ণ গ্রাম পাহাড়ের গা থেকে মুছে গেছে। ভাগ্যচক্রে গ্রামবাসীরা সে সময় অন্য গ্রামে ছিল বলে বিশেষ প্রাণহানি হয়নি। তাঁরা আবার নতুন করে একই স্থানে গ্রাম গড়ে তুলছেন। স্বামীজী বলেন, ভারতের ঋষি পরম্পরা বনে প্রতিষ্ঠিত। বৈদিক সংস্কৃতি, পৌরাণিক সংস্কৃতি সকলই বনজ পরম্পরা। তাঁর মতে, আদিবাসী শব্দ প্রয়োগ ঠিক নয়, বনবাসী শব্দ প্রয়োগই উচিত। উপেক্ষার কারণেই জনজাতির মধ্যে শিক্ষা ও সংস্কারের অভাব। তবে, পরম্পরাগত জীবনের মূল্যবোধ আজও তাদের মধ্যে জীবিত। বনবাসীদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বনবাসী কল্যাণ আশ্রম। কর্মীদের নিষ্ঠা, ত্যাগ ও সততার গুণে আজ কল্যাণ আশ্রম দেশে প্রায় ১৮,০০০ সেবাপ্রকল্প চালাচ্ছে। গঙ্গার ন্যায় পুণ্য সলিল দ্বারা পবিত্র করার মতো কল্যাণ আশ্রমও ভারতের বনাঞ্চলে তার প্রবাহ বইয়ে দিচ্ছে।

একদলীয় গণতন্ত্র

পশ্চিমবঙ্গে বিগত ১৮ মাসে টি এম সি সরকার যে গণতন্ত্রকে ধ্বংস করা এবং অসহিষ্ণুতা ও খামখেয়ালীপনার পরিচয় দিয়েছে তা নজিরবিহীন। বিরোধী দলের প্রতিনিধিদের সরকারি প্রশাসনিক মিটিং-এ যোগদানে বিরত রাখা এবং বিরোধী দলের জনপ্রতিনিধিদের বক্তব্য উক্ত সভায় পেশ করতে না দেওয়া নিঃসন্দেহে অগণতান্ত্রিক ও অসাংবিধানিক। তাছাড়া গত ৪ ডিসেম্বর ২০১২ দুবরাজপুরে লোবায় প্রকাশ্য জনসভায় মুখ্যমন্ত্রী প্রশাসন এবং দল, কার কথা বিশ্বাস করবেন তা বুঝতে পারছেন না। তৃণমূল নেতার বক্তব্য থানার ওসি-কে এখনও সরানো হয়নি। অপরদিকে পুলিশ সুপার জানান যে ওসি-কে সরিয়ে দেওয়া হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য ৬ নভেম্বর, ২০১২ জনতা- পুলিশ সংঘর্ষে দুবরাজপুরে পুলিশ গুলি চালায়নি। পুলিশ সংযত ছিল। তাহলে উনি এস-পি এবং ওসি-কে সরালেন কেন? গ্রামবাসীদের কোনও দোষ নেই। তবে কার দোষ? এব্যাপারে কোনও সদুত্তর মেলেনি। আবার ২ ডিসেম্বর সিঙ্গুরের জনসভায় কৃষিপ্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, টাটা-সিপিএম একজোট হয়ে এবং তাদের অনুগত বিচারক দিয়ে হাইকোর্টে আমাদের হারিয়ে দিয়েছে। বিচার ব্যবস্থার প্রতি বিরূপ মন্তব্য করার জন্য কলকাতা হাইকোর্ট অবমাননা মামলায় বেচারাম মান্নাকে ১৮ ডিসেম্বর তলব করেছে। পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এর জবাব দেবেন।

—অধ্যাপক আশিস রায়, হাওড়া-৩।

কংগ্রেসের পরিবারতন্ত্র

কংগ্রেসি চিত্রনাট্য মেনেই সোনিয়া মাইনো গান্ধী-তনয় রাহুল (বলুলভিঞ্চি) গান্ধী জয়পুরে কংগ্রেসের চিন্তন বৈঠক নামক এক পার্টি সম্মেলনে কংগ্রেসের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন। তবে একে নির্বাচিত না বলে মনোনীত বলাই শ্রেয়। কংগ্রেসি কালচারে নির্বাচন কথাটা আপেক্ষিক। সবই চাপিয়ে দেওয়া হয় উপর (হাইকমান্ড) থেকে। এক্ষেত্রেও হয়েছে তাই। কারণ কংগ্রেসে হাইকমান্ডই সর্বেসর্বা। আর এই সর্বেসর্বা যিনি, তিনি হচ্ছেন সোনিয়া গান্ধী। রাহুলের মাম্মি। কাজেই পরম্পরা মেনে মা যে পুত্রের জন্য এমন কাজটি করবেন তাতে আর

চিঠিপত্র

আশ্চর্যের কী? কংগ্রেসে অভিজ্ঞতার কোন মূল্য নেই। শেষ কথা বলবে নেহরু গান্ধী পরিবার।

তিনি ইউরোপীয় রীতি মেনে ৭০ বছর পরে রাজনীতি থেকে সন্ন্যাস নেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায় পুত্র রাহুলকে দলের শীর্ষে নিয়ে আসার পরিকল্পনা করেছেন এবং ২০১৪ সালের সাধারণ নির্বাচনের পর তাঁর প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পথে যাতে কোনও প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি না হয় তার জন্য তাঁর পথের কাঁটাও সাফ করে রেখেছেন। তাই তাঁকে সহ-সভাপতির পদ দিয়ে রাখা হয়েছে যাতে তিনি তাঁর মাতার শূন্য পদেরও অধিকারি হতে পারেন। এখানেই শেষ নয়। কন্যা প্রিয়াঙ্কাকেও নিয়ে আসতে চাইছেন রাজনীতির অঙ্গনে পাকাপাকিভাবে। সেজন্য তিনি নিজের লোকসভা কেন্দ্র রায়বেরিলিতে প্রিয়াঙ্কাকে দাঁড় করাতে চাইছেন। মোল্লা মুলায়ম নাকি এই কেন্দ্রটি প্রিয়াঙ্কা এবং আমেথি কেন্দ্রটি রাহুলকে ছেড়ে দিতে চেয়েছেন। কথায় বলে, "পড়েছ যখন যবনের হাতে, খানা খেতে হবে তারই পাতে।" কিন্তু কী আশ্চর্য। এই মুলায়মই একদা বিদেশিনী সোনিয়ার প্রধানমন্ত্রী হওয়ার তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তবে দুর্নীতিবাজ মুলায়ম যে সিবিআই তদন্তের ভয়ে এসব নাটক করতে বাধ্য হচ্ছেন তাতে নেই কোনও সন্দেহ। তাছাড়া রাজনৈতিক স্বার্থে রাজনীতিতে চিরশত্রু বলে কিছু নেই।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, সোনিয়া যখন ইতালিরও নাগরিক, পুত্র রাহুলও কী তাই নন? মায়ের জন্মসূত্রের নাগরিকতার সুবাদে তিনিও ইতালির ভোটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার যোগ্য। তাছাড়া রাহুলের শিরা-ধমনীতে বইছে পার্শি (ফিরোজের মা ছিলেন পার্শি), মুসলিম, হিন্দু ও খৃস্টান রক্ত। তবে ভারতীয় সংবিধান অনুসারে এতসব সত্ত্বেও এদেশে রাহুলের পক্ষে ভোটে দাঁড়াতে বাধা নেই। কংগ্রেসে রয়েছেন রাহুলের পিতা-পিতামহীর বয়সের বহু নেতা-নেত্রী। কিন্তু তাঁরা যতই বৃদ্ধ-বৃদ্ধা হোন না কেন কেউই গান্ধী -নেহরু বংশের মূল স্রোতের নন। তাই কংগ্রেসি পরম্পরা ও ঐতিহ্য, অর্থাৎ পরিবারতান্ত্রিক রীতি মেনেই রাহুলকে আনা হয়েছে তুলে, রাজনৈতিক যোগ্যতা তাঁর যাই থাকুক না কেন। পুরাকালে রাজার ছেলে (শিশু হলেও)-ই পেত সিংহাসন ও দেশশাসনের দায়িত্ব। কংগ্রেসেও চলছে সেই রাজতান্ত্রিক, পরিবারতান্ত্রিক ঐতিহ্য। মেরুদণ্ডহীন কংগ্রেসের আত্মসম্মানহীন নেতা-নেত্রীরা তাতেই খুশি। কারণ কংগ্রেস একটা সার্কাস পার্টি। এই পার্টিতে আছে নায়ক, খলনায়ক, জোকার, ব্রোকার, দুর্নীতিবাজ, চাটুকার, তৈলমর্দকদের দল, যাদের কাজ সোনিয়া-রাহুল-প্রিয়াঙ্কার নামে জয়ধ্বনি দেওয়া ও গুণকীর্তন করা। সত্যি বলতে কী, ধূর্ত সোনিয়া যখন বুঝতে পারলেন, তাঁর পক্ষে এদেশকে নেতৃত্ব দেওয়া অসম্ভব তখন সন্তানদের বিশেষ করে রাহুলকে যে প্রধানমন্ত্রীপদে বসাতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হবেন তা বলাই বাহুল্য। আসলে নেহরু-গান্ধী পরিবারের নেতৃত্ব ছাড়া যে কংগ্রেস এক তাসের ঘর তা বহুবার হয়েছে প্রমাণিত। এখন দেখার, রাহুলের নেতৃত্ব দেশবাসী মেনে নেন কিনা। কারণ জনতাই জনার্দন।

—ধীরেন দেবনাথ, কল্যাণী, নদীয়া।

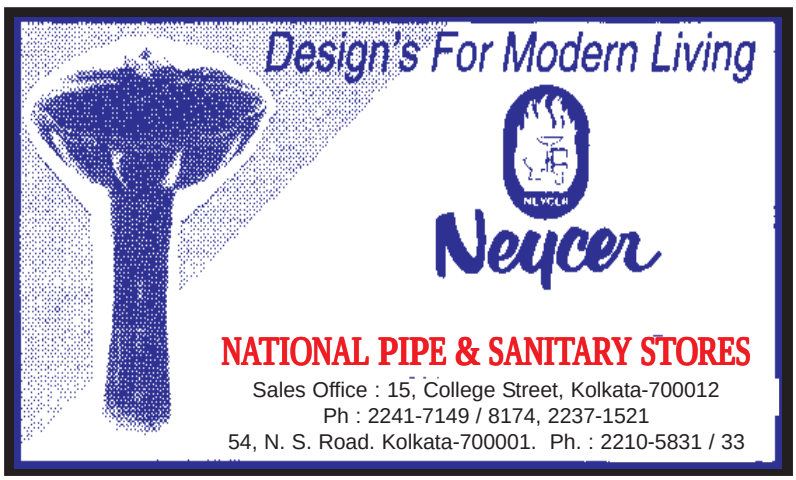

সভ্যতার 'বিলগ্নীকরণ'

ভাস্কর ভট্টাচার্য

সংবাদপত্রের শিরোনাম থেকে পাড়ার মোড়ে বাসে, ট্রেনে সর্বত্রই মানুষ একই আলোচনার আবর্তে ঘুরছেন 'ধর্ষণ' ও 'শ্লীলতাহানি'। প্রতিদিন কাগজে বেশকিছু ধর্ষণের ঘটনা আমরা পড়ছি। নারী ও পুরুষের এই প্রাকৃতিক চাহিদা, সৃষ্টির এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সভ্যতার আগে মানুষ বনে-জঙ্গলে নিরাবরণ অবস্থায় ঘুরত। দৈনন্দিন জীবনে শুধু চাহিদা বলতে ছিল খাদ্য যা দেহ ধারণের জন্য ছিল অপরিহার্য এবং আজও তা আমাদের কাছে অপরিহার্য। কিন্তু মানুষ যখন দেহের চাহিদায় সাড়া দিয়ে একে অন্যের (নর ও নারী) প্রতি আকর্ষিত হোত, তখন ছিল না কোনও নিয়ম, নীতি, জাতি, ধর্ম বর্ণভেদে কোনও লজ্জা, ভয়। ছিল না কোনও সমাজ ব্যবস্থা। ছিল না কোনও সম্পর্কের বাঁধন বা বিধিনিষেধ। একে অন্যকে ভোগ করত প্রয়োজন মতো, প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিয়ে যা অন্য প্রাণী জগতেও আমরা দেখতে পাই। সেই জন্য তখন ছিল না কোনও ধর্ষণের সংজ্ঞা। ছিল না নারীর শরীর ঢাকার কোনও ব্যবস্থা বা প্রবণতা। যার ফলে পুরুষের মধ্যে ছিল না কোনও কামের লোভ। ছিল না নারীর প্রতি নরের আলাদা কোনও আগ্রহ। সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে আমরা তৈরি করলাম সমাজ এবং সেই সমাজ তৈরি করল সংসার, মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক। সঙ্গে সঙ্গে মানুষ শিখল নিজের সভ্যতাকে অতি সন্তর্পণে ঢাকতে। নারীর অঙ্গের রূপ আবার কাছে হয়ে উঠল মনমোহিনী।

আমরা একে অন্যের জন্য অনুভব করলাম লজ্জা। এই 'লজ্জা' নামক বস্তুটিই মানুষকে বাধ্য করল পরিধান গ্রহণ করতে। অর্থাৎ সভ্য সমাজের মূল কথাই হলো নিজের শরীরকে পরিধানবস্ত্রে এমনভাবে ঢাকা যা সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়। অর্থাৎ সমাজও সেই ভাবে তৈরি হলো, যে কোনটি গ্রহণ করা উচিত সমাজের বুকে মানুষের তৈরি সভ্যতাকে টিকিয়ে রাখার জন্য।

সুতরাং নারীর প্রতি নরের আকর্ষণ, তখন শিক্ষার প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে পরিশীলিত হতে আরম্ভ করল। মানুষ শিখল সংযম। অর্থাৎ নারী মাত্রই ভোগ্যা, এই ধারণা সরিয়ে নারীকে আমরা দিলাম আলাদা মর্যাদা এই সমাজের বুকে। কখন 'মা' বলে, কখনও ভগিনী, কন্যা ও স্ত্রীরূপে। এছাড়া অন্যান্য সম্পর্ক তৈরি হলো নর ও নারীর বিবাহ বন্ধনের মধ্য দিয়ে। এ সবকিছুই কিন্তু হয়ে উঠল শিক্ষিত সমাজের অঙ্গরূপে। অর্থাৎ তখন থেকেই একে অন্যকে মর্যাদা দিতে শিখলাম। নারীত্বের অবমাননা সমগ্র সমাজের ও সংসারের অবমাননা বলে এখনও আমরা মনে করি। কিন্তু মনে রাখতে হবে নারীর শরীরের প্রতি পুরুষের আকাঙ্ক্ষা সহজাত এবং অনস্বীকার্য। এই আকাঙ্ক্ষাকে পায়ে বেড়ি পরিয়ে মনের মধ্যে আমরা দমন করে রেখেছি মাত্র। কারণ এই প্রবৃত্তিকে ত্যাগ কখনও সম্ভব নয়। তাহলে সৃষ্টিই লোপ পেয়ে যাবে। সুতরাং মনে রাখতে হবে এই প্রবৃত্তি আমাদের সকলের মধ্যেই আছে। কিন্তু তাকে আমরা প্রয়োজনে জাগিয়ে তোলার ক্ষমতা লাভ করেছি সমাজের প্রবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে। সমাজের নানান স্তরে ছড়িয়ে আছে এই কামনার আগুনকে উসকিয়ে তোলার প্রবণতা।

আমরা সবাই চিৎকার করছি, কাগজে বড় বড় কথা লিখছি, প্রতিবাদ করছি, দূরদর্শনের পর্দায় কথার চাতুরিতে নানান ভাবে নিজেদের মতামত জাহির করছি। কিন্তু কেউ একবার ভাবছি না এই সর্বনাশের মূলে আজ আমরাই। আজ কাগজের বিজ্ঞাপন থেকে আরম্ভ করে চলচ্চিত্র প্রদর্শনের মাধ্যমে, গানের কথা থেকে শুরু করে তার সুরের মূর্চ্ছনার মাধ্যমে আমরা কি এই কামনার পাশবিক চেহারাকে জাগিয়ে তুলছি না? প্রতিটি স্তরে নারীকে ভোগ্যপণ্য করে তার সেই সৌন্দর্যের মাধুরীকে মাদকতায় নামিয়ে এনে বর্তমান প্রজন্মের কাছে আমরা কি হাজির করছি না? প্রতি মুহূর্তে, দূরদর্শনের পর্দায়, রাস্তার বিজ্ঞাপনে, এমনকি ইন্টারনেটের মাধ্যমে যে সমস্ত বিনোদন বস্তু আমরা আমাদের যুবক-যুবতীদের সামনে হাজির করছি— রীতিমতো সরকারি মদতে, তা কি তাদের মধ্যে সুপ্ত বাসনাকে জোর করে জাগিয়ে তোলার জন্য যথেষ্ট নয়? বিশেষ করে আমাদের সমাজে যেখানে শিক্ষার এত অভাব নানান বৈষম্যের ভারে যখন আমরা নিমজ্জিত, তখন কাউকে বলতে শুনলাম না যে এই সমস্ত অপ-সংস্কৃতি বন্ধ করতে হবে! সরকারের দায়িত্ব আছে এই প্রদর্শন-দূষণ রোধ করার জন্য প্রয়োজনে আইন সংশোধন করে সামাজিক ব্যবস্থাকে রক্ষা করা। শুধু কাউকে ফাঁসি দিয়ে যদি ধর্ষণের মতো জঘন্য অপরাধ রোধ করা যেত, তাহলে ধনঞ্জয়ের ফাঁসির পরও কেন এমন হচ্ছে। আইন আছে কিন্তু তা আছে সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিদের জন্য, রাজনৈতিক ক্ষমতার অলিন্দে থাকা মানুষকে শুধু রক্ষা করার জন্য। সাধারণের জন্য তা পরিচালিত হয় না। প্রশাসনকে কার্যত পঙ্গু করে রাখার ফলে, প্রশাসনিক আধিকারিকরা শুধু চাকরি বাঁচাবার তাগিদে কাজ করেন।

আইনকে ঠিকভাবে সমাজের বুকে পরিচালিত করে, সাধারণ মানুষের পাশে যদি পুলিশ প্রশাসনকে কাজ করার অধিকার দেওয়া হয় এবং বিনোদন জগতের ওপর কড়া নিষেধাজ্ঞা জারি করে, আইন প্রণয়ন ও কার্যকর করা হয়, তবেই এই ভয়ানক রোগের হাত থেকে আমাদের মুক্তি। ভাবের ঘরে চুরি করা বন্ধ হোক।

হরিনাম সংকীর্তনের ইতিহাস

রবীন সেনগুপ্ত

আজ থেকে প্রায় পাঁচশ বছর পূর্বে শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মের সংস্কার আন্দোলনে সাফল্য লাভ করেছিলেন। যার জন্য মহাপ্রভুকেই অনেকে হরিনামের স্রষ্টা বলে মনে করেন।

কিন্তু পুরাতন পুঁথি গবেষণা করে দেখা গেছে যে হাজার হাজার বছর পূর্বেও হরিনাম সংকীর্তনের অস্তিত্ব ছিল। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ থেকে জানা যায় যে শ্রীকৃষ্ণের অন্নপ্রাশনের দিন নন্দগোপ আরও নানা অনুষ্ঠানের সঙ্গে হরিনাম সংকীর্তনও রেখেছিলেন। অর্থাৎ হরিনাম শ্রীকৃষ্ণের জন্মের পূর্ব থেকেই রয়েছে। কারণ শ্রীকৃষ্ণ জন্মের পূর্বেও শ্রীহরির নানা অবতার পৃথিবীতে জন্মেছিলেন। চৈতন্যমহাপ্রভু এই কীর্তন বিশেষ ভাবে ব্যবহার করেন— কিন্তু তিনি এই কীর্তনের স্রষ্টা নন।

অথর্ব বেদের একটি শাখাতেও হরেকৃষ্ণ কীর্তনের নির্দেশ রয়েছে। সেখানে বলা হয়েছে যে— ''স এব মূলমন্ত্রং জপতি হরিমিতি কৃষ্ণ ইতি রাম ইতি... নামান্যষ্টাবষ্ট চ শোভনান্তিতানি নিত্যং যে জপন্তি ধীরাস্তে বৈ মায়ামতিরন্তি...

কলিসন্তরণ উপনিষদেও এই বিষয়ে শ্লোক আছে। শ্লোকগুলি এইরূপ : হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে / হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে / ইতিষোড়শং নাম্নাং কলি কল্মষনাশনম্ / নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ববেদেষু দৃশ্যত।

পদ্মপুরাণ শাস্ত্রের পাতালখণ্ডের ৩৯ তম অধ্যায়ে ভগবান শিব পার্বতীকে বলছেন : হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামেব কেবলম্। হরে রাম হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণেতি মঙ্গলম্।। এবং 'বদন্তি যে নিত্যং ন হি তানবাধতে কলিঃ।... মন্নাম চৈব ত্বন্নাম যো জপিত্বা ব্যতিক্রমাৎ। সোঽপি পাপাদবিশ্যচতে তুলরাশেরিবানলঃ।

এই শ্লোকটির খুবই গুরুত্ব আছে। কারণ এই শ্লোকে স্বয়ং ভগবান শিব বলেছেন, হরেকৃষ্ণ নাম অথবা তোমার নাম কিংবা আমার নাম যারা নিয়মিত জপে তাদের কলি আক্রমণ করে না।

কিন্তু ইস্কন সহ অনেক বৈষ্ণব সংস্থা ও প্রচারকরা শুধু প্রথম শ্লোক দুটি ব্যবহার করে মানুষকে বোঝাতে চান যে শুধু হরের্নাম করলেই হবে। সাত্ত্বিক ভাবে শিব ও দুর্গা বা তাঁর রূপান্তর কালীমায়ের নামও যে মুক্তিদায়ী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পাল্লা ভারী করার জন্য তা তারা প্রচার করেন না। এরকম অর্ধসত্য কিন্তু মিথ্যার চেয়েও ক্ষতিকারক। এতে হিন্দুদের মধ্যে অযথা মনোমালিন্য ও ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।

হরিনাম সংকীর্তন দ্বারা সেযুগে চৈতন্য মহাপ্রভু ভারতের একটা বৃহৎ অংশকে মাতিয়ে তুলেছিলেন। এ যুগে ইস্কনের প্রতিষ্ঠাতা শ্রীল প্রভুপাদও ওই হরেকৃষ্ণ নাম দিয়েই সারা বিশ্বের বেশ কিছু মানুষকে আকৃষ্ট করে ৫০০টির অধিক কীর্তন ও গীতা প্রচার কেন্দ্র স্থাপন করেছেন। অনুকূল ঠাকুর, সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ, বালক ব্রহ্মচারী এঁরাও হরিনাম সংকীর্তন ব্যবহার করেছেন। লোকনাথ বাবার শিষ্যরাও হরিনামের অনুষ্ঠান করে থাকেন। জগৎবন্ধু প্রভু, হরিচাঁদ ঠাকুর এঁরাও নাম সংকীর্তনে দক্ষ ছিলেন।

সমাজে যে ধরনের হরিনাম বহুল প্রচলিত আছে তার অধিকাংশই লোকায়ত বা গ্রাম্য ধরনের সুর। এসব ছাড়াও ক্লাসিক্যাল সুরে অনবদ্য সব হরিনাম সংকীর্তনের সুর রয়েছে। নদীয়া মুর্শিদাবাদ কলকাতা ও বর্ধমানের একাধিক সম্প্রদায় জনাকীর্ণ আসরে এইসব লাইট ক্লাসিক্যাল সুরের কীর্তন গেয়ে থাকেন। ভজন সম্রাট অনুপ জালোটা, অমৃক সিং অরোরা, দেবজিৎ, শান্তা দাস, সুমন ভট্টাচার্য ওঁরা নানা সময়ে নাম সংকীর্তনের মধ্যে উচ্চাঙ্গ সংগীতের অপূর্ব ব্যবহারিক প্রয়োগ ঘটিয়ে রেকর্ড প্রকাশ করেছেন। কোথাও যদি এই বলে প্রশ্ন তোলা হয় যে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ হিট গান কোনটি তাহলে উত্তর হবে অবশ্যই হরিনাম সংকীর্তন। কারণ এত হাজার হাজার বছর ধরে কয়েক শত রকমের সুরে দিনের পর দিন বড় অনুষ্ঠানের আসর বসিয়ে হরেকৃষ্ণ মহামন্ত্র ছাড়া আর কোনও গান বিশ্বে গাওয়া হয় না। অন্যান্য গান যথা বাউল, রবীন্দ্রসংগীত, নজরুলগীতি, পপ গান, জ্যাজ-বিটলস রক জাতীয় গান, আধুনিক গান এগুলোরও আসর বসে। কিন্তু এসব আসরে নানা রকম গান গাওয়া হয়। একটি গান দিয়ে আসর মাত করা যায় না কোথাও।

কিন্তু কীর্তনের আসরে ওই বিশ্ববিখ্যাত ষোল নাম বত্রিশ অক্ষরের গানটিকেই হরেক সুরে গেয়ে দিনের পর দিন শ্রোতাদের ধরে রাখা সম্ভব হয়। এমনই যাদু আছে এমনই মধু আছে এই হরিনাম সংকীর্তনে।

গরুড় পুরাণের এই সংক্রান্ত একটা শ্লোক দিয়ে (পূর্বখণ্ড ২২৭ অধ্যায় ৩৬, ৩৭ তম শ্লোক) প্রবন্ধটির ইতি টানছি— ''কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তবন্ধঃ ব্রজেৎ। কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণু ত্রেতায়াং যজতঃ ফলম্। দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ।।''

ভগবতী ভারতী

নবকুমার ভট্টাচার্য

সুপ্রাচীন ভারতীয় ধ্যানধারণার প্রাচীনতম দলিল ঋক্‌বেদ। সেখানে সরস্বতীকে যজ্ঞাগ্নিরূপে, নদীরূপে আবার বাক্‌দেবীরূপেও স্তুতি করা হয়েছে। নদীরূপা সরস্বতী একটি নয় দুটি। একটি স্বর্গে, অপরটি মর্ত্যে। মর্ত্যের সরস্বতী এক নদী। স্বর্গের সরস্বতী শুভ্রা জ্যোতির্ময়ী নদী। ইনি দিব্য সরস্বতী। এই দেবীকে 'অম্বিতমে' নদীতমে, দেবিতমে— শ্রেষ্ঠা জননী, নদী ও দেবীরূপে স্তুতি করা হয়েছে।

যে নদী জাগতিক সুখের উৎস, সেই সরস্বতী আর নদীমাত্র রইলেন না। পরম প্রজ্ঞাদাত্রী রূপে প্রতিভাত হলেন। অন্নপুষ্ট ব্যক্তিই জ্ঞান লাভ করেন, সত্যবাক্য উচ্চারণে সক্ষম হন এবং কর্মযজ্ঞে নিজেকে নিয়োজিত করেন। সরস্বতীর আনুকূল্যই এই শক্তির আকর। সরস্বতী সম্পূর্ণ দেবত্বে সংস্তুতা হয়েছেন দেবশ্রবা ঋষির ঋক্‌মন্ত্রে।

মহাভারতের বনপর্বে সরস্বতী তার্ক্ষ্য সংবাদে (১৮৬ অঃ) সরস্বতী বলেছেন, 'আমার দিব্যরূপ দর্শন, ও আমাকে যজ্ঞ রূপা বোধ করিলে মুক্তিলাভ করিবে।' ভাগবত পুরাণে দেবী সরস্বতী ব্রহ্মার পত্নী (৩।১২, ২৮-৩০) আবার মুখ হতে নির্গত হওয়ায় কন্যাও বটে। মৎস্যপুরাণে বলা হয়েছে, যেখানে ব্রহ্মা সেখানেই সরস্বতী (৪।৮)। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে সরস্বতী শ্রীকৃষ্ণের মুখ হতে জাতা। আবার লক্ষ্মী-সরস্বতী গঙ্গা রূপে তিন পত্নীরও অন্যতমা। সপত্নী কলহের কারণে পরস্পরের অভিশাপে এঁরা নদীরূপে মর্তে আগমন করেন। শিবপুরাণে ইনি গৌরী শিবানী। বামন পুরাণে মৃড়াণী বা ব্রহ্মাণী। তন্ত্রে গায়ত্রী ও সরস্বতীর অভেদরূপ কল্পনা করে ত্রিবিধ রূপের কথা বলা হয়েছে— সকালে গায়ত্রী ব্রাহ্মীরূপা, মধ্যাহ্নে বৈষ্ণবী এবং সন্ধ্যায় সরস্বতী। বরাহ পুরাণের মতে— দৈব তেজে যে মহাশক্তি জন্মনিলেন তিনিই ত্রিধাবিভক্ত হয়ে ব্রাহ্মী বৈষ্ণবী ও রৌদ্রী তিন মূর্তি লাভ করলেন। আসলে সৃষ্টি স্থিতি ও লয়— এ তিন কর্মের অধিদেবতা রূপে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের রূপের কল্পনা পুরাণ সাহিত্যে স্থান লাভ করেছে। এঁদের শক্তিত্রয়ী ব্রাহ্মী-বৈষ্ণবী ও রৌদ্রী একই শক্তির ত্রিধা প্রকাশ বলে প্রচারিত। এভাবে ব্রহ্মাণী অর্থাৎ সরস্বতী। বৈষ্ণবী অর্থাৎ লক্ষ্মী এবং মাহেশ্বরী অর্থাৎ দুর্গা একই শক্তির তিনরূপ। পুরাণের দেবীর রূপ শুভ্রবর্ণা। বেদে দিব্যবর্ণা। যদিও ঋষি বশিষ্ঠের ধ্যাননেত্রে সরস্বতী শুভ্রা। মৎস্যপুরাণে বীণা, কমণ্ডলু, অক্ষমালা ও পুস্তক— চারহস্তে শোভিতা দেবীকে পঞ্চমী তিথিতে আরাধনা করতে বলা হয়েছে। অগ্নিপুরাণে দেবী চতুর্ভুজা।

এই পুরাণের বাগীশ্বরীর ধ্যানে তিনি চতুর্ভুজা হয়েছেন। এক হস্তে পুস্তক অন্য হস্তে অক্ষসূত্র। অপর দুই হস্ত বরদ ও অভয়। লিখিত আছে, বাগীশ্বরীর পুজো করলে লোকে সংস্কৃত কবি এবং কাব্যশাস্ত্রবিদ্ হয়। বৃহদ্ধর্মপুরাণে (২৫।

পরম্পরা

৩৯) সরস্বতী শুক্লবর্ণা শুক্লবস্ত্রা শুক্লাভরণ ভূষিতা। মুকুন্দরাম চক্রবর্তী তাঁর চণ্ডীকাব্যে সরস্বতী বন্দনায় লিখেছেন, 'শ্বেতপদ্ম অধিষ্ঠান, শ্বেতবস্ত্র পরিধান। শিরে শোভে ইন্দুকলা করে শোভে জপমালা, শুকশিশু শোভে বাম করে।' স্মার্তপণ্ডিত রঘুনন্দন ভট্টাচার্য শারদতিলক নামক তন্ত্রগ্রন্থ থেকে সরস্বতীর বর্তমান যে ধ্যান মন্ত্র প্রচার করেছেন সেখানে সরস্বতী দ্বিভুজা।

আমাদের দেশের কবি সাহিত্যিক সকলেই সরস্বতী চরণে ঐশ্বর্য সিদ্ধিলাভ করার জন্য প্রার্থনা করে গেছেন। কবি কৃত্তিবাস লিখেছেন 'সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে। কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতী বরে।'

ভারতচন্দ্রের সরস্বতী শুভ্রতার প্রতীক : 'শ্বেতবর্ণ শ্বেতবাস/ শ্বেতবীণা শ্বেতহাস/ শ্বেতসরসিজ নিবাসিনী।' বিহারীলাল চক্রবর্তীর সারদামঙ্গল কাব্যে সারদা বন্দনা : 'ব্রহ্মার মানস সরে/ফুটে ঢল ঢল করে/ নীলজলে মনোহর সুবর্ণ নলিনী—/ পাদপদ্ম রাখি তায়/ হাসি হাসি ভাসি যায়/ ষোড়শী রূপসী বামা পূর্ণিমা যামিনী।'

কবি নবীন চন্দ্র সেনের কলমে সারদা বন্দনা—

'উত্তরে ভারতীদেবী রজতবরণা/
মানস সরস পঙ্কজবাসিনী
বেদমাতা করে শোভে চারুবীণা/
সঙ্গীত সাহিত্যশাস্ত্র প্রসবিনী।'
'সোনারতরী'তে রবীন্দ্রনাথ
জানিয়েছেন শ্রেষ্ঠ প্রণতি—
"প্রকাশো জননী নয়নসমুখে/ প্রসন্ন মুখছবি।
বিমল মানস সরসবাসিনী/ শুক্লবসনা শুভ্রহাসিনী
বীণাগঞ্জিত মঞ্জুভাষিণী/
কমলকুঞ্জাসনা।।"

(সরস্বতী পুজো উপলক্ষে প্রকাশিত)

পৌরাণিক নগর প্রয়াগ

গোপাল চক্রবর্তী

প্রয়াগের বর্তমান নাম এলাহাবাদ। বৈদিক যুগের অন্যতম জনপদ প্রয়াগ। পুরাণে প্রয়াগের উল্লেখ আছে। গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ৩১৬ ফুট উপরে এর অবস্থান। গঙ্গার অপর তীরে ঝুসি শহর ও পুরাণোক্ত প্রতিষ্ঠান বা কেশি অভিন্ন। রাজা হরবোঙ্গ-এর নামানুসারে পূর্বে একে হরবোঙ্গপুর বলা

হোত। সম্রাট আকবরের সময় এটি হাদিয়াবাস নামে পরিচিত ছিল। এখানে দুটি স্তূপ, একটি দুর্গের ভগ্নাবশেষ, গুপ্ত যুগের কিছু সুবর্ণমুদ্রা এবং ত্রিলোচনপালের একটি তাম্রশাসন আবিষ্কৃত হয়েছে। কোশমে দুর্গের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। এখানকার একটি আধুনিক জৈন মন্দির, একাদশ শতাব্দীর জৈন ভাস্কর্যের বহু নিদর্শন এবং ৫ম-৬ষ্ঠ শতাব্দীর একটি প্রস্তর স্তম্ভ উল্লেখযোগ্য। ভীটা ও ফুলপুর বহু প্রাচীন জনপদ।

প্রয়াগ অতি পবিত্র তীর্থস্থান। এটি গঙ্গা-যমুনার সঙ্গমস্থল এবং সরস্বতী এখানে মিলিত হয়েছে বলে এর নাম ত্রিবেণী। এখানে প্রতি বারো বৎসর অন্তর কুম্ভমেলা ও ছয় বৎসর অন্তর অর্ধকুম্ভ মেলায় বিপুল সংখ্যক পুণ্যার্থীর সমাগম হয়। প্রতি বছর মাঘ মাসে মাঘ মেলাতেও প্রচুর লোক সমাগম হয়। অশোকের সময় (খৃঃ পূঃ ২৭৩- ২৩২) থেকেই প্রয়াগ বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করে। এই অঞ্চল সম্ভবত প্রথম চন্দ্রগুপ্তের শাসনাধীনে ছিল। তবে প্রয়াগ যে সমুদ্রগুপ্তের শাসনাধীনে ছিল তার বহু প্রমাণ বর্তমান। গুপ্তবংশের পরবর্তী রাজা কুমারগুপ্ত (৪১৫-৫৫ খৃস্টাব্দ) প্রতিদ্বন্দ্বী মৌখরী রাজ ঈশান-বর্মনকে পরাজিত করে প্রয়াগ পর্যন্ত অগ্রসর হন। হিউয়েন সাঙ এর বিবরণীতে উল্লেখ আছে যে পূর্ব পুরুষদের ন্যায় সম্রাট হর্ষবর্ধন প্রতি পাঁচ বছর অন্তর সঞ্চিত সমস্ত ধনরত্ন গঙ্গা যমুনার সঙ্গমস্থল প্রয়াগে বিতরণ করে দিয়ে নিঃস্ব হতেন। শেষ পর্যন্ত নিজের পরিধেয় বস্ত্রটি পর্যন্ত দান করে ভগ্নী রাজ্যশ্রীর কাছ থেকে একটি নতুন বস্ত্র নিয়ে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করতেন। হিউয়েন সাঙ্ এর সময় প্রয়াগ হীনযান বৌদ্ধধর্মের বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। চতুর্দশ শতকে সন্ত রামানন্দ এখানে জন্মগ্রহণ করেন।

খৃস্টীয় পঞ্চদশ শতকে এই অঞ্চল জৌনপুরের সুলতানদের শাসনাধীন ছিল। আকবর (১৫৪২-১৬০৫ খৃস্টাব্দ) তাঁর সাম্রাজ্যকে যে ১৫টি সুবা বা প্রদেশে বিভক্ত করেন এলাহাবাদ তার অন্যতম। আকবরের রাজত্বের শেষদিকে শাহজাদা সেলিম (জাহাঙ্গীর) এই প্রয়াগ বা এলাহাবাদে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার সময়ে অযোধ্যার নবাব কিছুদিনের জন্য প্রয়াগের উপরে কর্তৃত্ব করেন। একসময়ে মারাঠারাও অল্পদিনের জন্য প্রয়াগের উপর আধিপত্য বিস্তার করে। অবশেষে ১৭৬৫ খৃস্টাব্দে ইংরেজরা এই অঞ্চল দিল্লীর সম্রাট শাহআলমের হস্তে প্রদান করে। কিন্তু ১৭৭০-৭১ খৃস্টাব্দে শাহআলম মারাঠাদের আধিপত্য স্বীকার করলে ওয়ারেন হেস্টিংস সম্রাটের হাত থেকে কোরা ও এলাহাবাদ কেড়ে নেন এবং বার্ষিক পঞ্চাশ লক্ষ টাকা ও একদল ইংরেজ সৈন্যের ব্যয়ভার বহনের বিনিময়ে এই অঞ্চল অযোধ্যার নবাবের হস্তে অর্পণ করেন। ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের সময় প্রয়াগ বা এলাহাবাদ ছিল বিদ্রোহের অন্যতম কেন্দ্রস্থল। হাইকোর্ট, বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি প্রয়াগ বা এলাহাবাদ সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার অন্যতম কেন্দ্র ছিল। মোতিলাল নেহরু, মদনমোহন মালব্য, তেজবাহাদুর সাপ্রু, সি. ওয়াই চিন্তামণি প্রমুখ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের কর্মকেন্দ্র ছিল এই অঞ্চল। বামনদাস বসু ও শ্রীশচন্দ্র বসু প্রতিষ্ঠিত এখানকার পাণিনি কার্যালয় থেকে বহু গ্রন্থ প্রকাশিত হয়।

এখানকার অক্ষয় বট সংলগ্ন ভূগর্ভস্থ মন্দিরটি অতি প্রাচীন। হিউয়েন সাঙের বিবরণে অক্ষয়বটের উল্লেখ আছে। ভরদ্বাজ মন্দির ও নাগমন্দির এখানকার উল্লেখযোগ্য দ্রষ্টব্য।

বাঁশিওয়ালার গল্প নিয়ে নাটক

অয়নাংশু ছোটোদের নাটক শেখায়। এক অফিসে চাকরি করে। যথেষ্ট দায়িত্বশীল, কর্মনিষ্ঠ এবং দক্ষ। সে নিজে একটা নাট্যগোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত। সেখানে সক্রিয় ভূমিকা তার। ছোটোদের একটা সংস্থায় শনিবার বিকেলে আর রবিবার সকালে ছবি আঁকা আর নাটক শেখায়। সংস্থার প্রতি দুর্বলতা আছে তার। পাঁচ বছর বয়স থেকে পনেরো বছর পর্যন্ত সেখানে থেকে তালিম নিয়েছিল অভিনয় আঁকা আবৃত্তি আর গানে। নাচার সুযোগও ছিল। সে আগ্রহী হয়নি।

অভিনয় আর আঁকাতেই তার মনোযোগ ছিল বেশি। ছোটোদের সংস্থার দুটো অনুষ্ঠান হোত কলকাতার নামকরা মঞ্চে। অয়নাংশু অংশ নিয়েছে। লোকজন দেখে তারিফ করেছে। আনন্দ পেয়েছে ছোটোবড়ো সকলেই। ছোটোদের সংস্থায় পনেরো বছরের বয়সের পর থাকা যায় না। অয়নাংশু পড়াশোনার চাপে অন্য কোথাও যোগ দিতে পারেনি। কয়েকবছর মন দিয়ে পড়াশোনার শেষে একটা নামকরা কোম্পানিতে চাকরি পাবার পর অবসর সময়টা নাটক নিয়ে মেতে উঠতে চেয়েছিল। যোগাযোগ ছিল ছোটোদের সংস্থার সঙ্গে। সেখানেই তো তার শৈশব-কৈশোর কেটেছে। সংস্থার সকলেই তাকে ভালোবাসেন। সম্পাদক বাসুদেব গুপ্ত বললেন অয়নাংশুকে, 'তুই সময় করে আয়। যোগ দে। একসময় শিখতে এসেছিলি। এবার শেখাবি।' অয়নাংশু রাজি হয়। জানায়, 'শনিবার সম্ভব হবে না। রবিবার সকালে আসবো।' সেই থেকে অয়নাংশু প্রশিক্ষক হিসেবে যুক্ত। দশ বছর হয়ে গেলো। এর মধ্যে তার পরিচালনায় অনেকগুলো নাটক হয়েছে। ছেলেবেলায় অয়নাংশুরা যাঁর কাছে নাটক করতে শিখেছিল সেই শঙ্করীপ্রসাদ রয়েছেন এখনও। অয়নাংশুর পিসতুতো দাদা অর্জুন পরিচয় করিয়ে দিয়েছিল হোতুর সঙ্গে। হোতু বলেছিল, 'আমি অনুষ্ঠানে সকলের টিফিনটা দিতে চাই। তোমরা নিতে রাজি হবে কি? তোমাদের স্মারকগ্রন্থে একটা বিজ্ঞাপনও দেবো।' অয়নাংশু জানিয়েছিল, আপনি যেভাবে সাহায্য করবেন তাতেই আমরা রাজি।'

ছোটোদের নিয়ে অনুষ্ঠান উত্তর কলকাতার এক মঞ্চে। হোতু টিকিট কিনেছিল পাঁচটা। সে ছাড়া চারজন গিয়েছিল। কোতু শিটু চিকলি নাটক-টাটক বুঝতে চায় না। ধৈর্যও নেই। হোতু এমন চারজনকে টিকিট দিয়েছিল ছোটোদের কাজ আগ্রহের সঙ্গে দেখার মন যাদের আছে। হোতু অনুষ্ঠান শুরুর দশ মিনিট আগে হলে ঢুকল। তার আগে বন্ধ করে দিল চলমান ফোন। নাটক : বাঁশিওয়ালা। ছোটোরা অভিনয় করছে। নাটক লিখেছে পরিচালনা করছে অয়নাংশু চট্টোপাধ্যায়। এই ছোটোদের সংস্থায় নেপথ্যে বড়োরা থাকলেও মঞ্চে শুধু ছোটোরাই আসে। নাটক শুরু হয় একেবারে নির্দিষ্ট সময়ে। হোতু ছোটোদের সব অনুষ্ঠান মন দিয়ে দেখতে চায়।

শুরু হলো নাটক। সেই বিখ্যাত হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালাকে অন্যভাবে নাটকে ধরেছে অয়নাংশু। ছোটোদের ভালো লেখার কোনও দেশ কাল গণ্ডি নেই। তা চিরকালের। বাঁশিওয়ালার মধ্যে ব্যক্তিত্ব ও প্রাণবন্ত ভাবটা রয়েছে। দেশে ইঁদুরের অত্যাচারে সকলে অস্থির। ঘরে বাইরে মাঠে ঘাটে ইঁদুর ছেয়ে গেছে। দেশের রাজা দেখল ব্যাপারটা বেশ গোলমেলে। রাজবাড়ির আনাচে কানাচে ইঁদুর। সংখ্যা বাড়ছে ইঁদুরের রাতারাতি। দেশের লোক দাবি জানাল ইঁদুর তাড়াতে হবে। সারা রাজ্যে ঢ্যাঁড়া পেটানো হলো, 'যে ইঁদুর তাড়াতে পারবে তাকে তিনশো একর জমি বাগান সমেত বাড়ি আর এক কোটি টাকা দেওয়া হবে।' একজন বাঁশিওয়ালা হাজির হলো। সে বলল রাজাকে, 'কথা রাখবেন তো?' রাজা বলল, 'অবশ্যই।' বাঁশিতে সুর ধরল বাঁশিওয়ালা। একটানা বাজাতে থাকল নীল বাঁশি। লোকে দেখল বাঁশিওয়ালা এগিয়ে চলেছে দুলতে দুলতে দ্রুত পায়ে। ছোটোবড়ো ইঁদুররা ছুটে ছুটে আসছে। ইঁদুর নিয়ে বাঁশিওয়ালা চলে গেলো সমুদ্রের ধারে। ইঁদুররা লাফ দিয়ে পড়ল জলে। হাবুডুবু খেতে লাগল। সমুদ্রের মাছেরা খেয়ে নিল ইঁদুর। বাঁশিওয়ালা ফিরে এল রাজার কাছে।

অনেকক্ষণ বাঁশি বাজিয়ে সে ক্লান্ত। রাজাকে অভিবাদন করে দাঁড়াল। রাজা বলল, 'ইঁদুর তাড়ানো যায় বাঁশি বাজিয়ে এটা দেখলাম। কাজটা এমন কিছু নয়। তুমি বড়জোর দুশো টাকা পাবে।' বাঁশিওয়ালা বলল, 'কথা রাখলেন না তো রাজা!' সে টাকা না নিয়ে বেরিয়ে এলো রাজপ্রাসাদ থেকে। থলে থেকে লাল বাঁশি বাজিয়ে অন্য সুর ধরল। ছোটোরা ছুটতে শুরু করল বাঁশিওয়ালার পিছন পিছন। পাহাড় পেরিয়ে চলে গেলো বাঁশিওয়ালা আর ছেলের দল। লোকজন ক্ষেপে উঠল রাজার উপর। রাজা গুণ্ডা বদমাশদের দিয়ে লোকজনদের দমন করতে চাইল।

এবার বাঁশিওয়ালা এল অন্য সাজে। কেউ চিনতে পারল না। সে কালো বাঁশিতে সুর তুলল। এবার ছুটতে শুরু করল দেশের খারাপ মানুষরা একেবারে নেশাকরা লোকদের মতো। সকলে দেখল রাজাও আছে তার মধ্যে। একটা বড় জেলখানায় আটকে গেলো সেই লোকগুলো। বদমাশের দল।

বাঁশিওয়ালা লাল বাঁশিতে আবার সুর তুলল। ছোটোরা ছুটে ছুটে ফিরে এলো। তারা যেন আনন্দে কদিন কোথাও কাটিয়ে ফিরল। বাঁশিওয়ালাকে ঘিরে তারা নাচল। সকলের হাতে একটা করে বাঁশি। বাঁশিওয়ালার উপহার। এবার বাঁশিওয়ালা বিদায় নিতে চাইল সকলের কাছে। ছোটোবড়ো সকলে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে। চোখে জল। বাঁশিওয়ালা দূরে চলে গেলো। কিছু না নিয়ে সে ফিরে চলল তার নিজের দেশে।

হোতু নাটক শেষে গ্রিনরুমে গিয়ে শুভেচ্ছা জানাল সকলকে।

লেখা : কৌশিক গুহ।। ছবি : রমাপ্রসাদ দত্ত

বইয়ের টানে

গানের কথা ঠিকমতো পড়া

দেবাদৃতা গান শেখার সময় মন দিয়ে কথাগুলো শোনে কিংবা পড়ে। স্পষ্ট আর নির্ভুল উচ্চারণ অভ্যেস করতে হয়। আমরা সকলেই দেখেশুনে শিখি। আশপাশের লোক ভুল উচ্চারণ করলে তা শুনতে শুনতে ছোটোরা অভ্যেস করে। আবার স্কুলে ঠিকমতো উচ্চারণ শিখলে আর তা অভ্যেস করলে ত্রুটি শোধরানো সম্ভব। সবই হতে পারে। সেজন্যে সচেতন হতে হবে। কোনও কোনও শব্দের উচ্চারণ কেউ কেউ ক্রমাগত ভুল করে। সেই ভুল শোধরানোর ইচ্ছে আর চেষ্টা থাকা দরকার। আমরা সবই তো আস্তে আস্তে শিখি। অঙ্ক জানি না, শিখি। ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান ওইভাবে হয়। গান গাইতে শিখি। অভ্যেসের মাধ্যমে অনেক কিছু রপ্ত করা সম্ভব। গান শিখতে হয় ধাপে ধাপে। কানকে তৈরি করা চাই। শুধু তো কান নয়, মনও। গান শুধু গলার ব্যায়াম বা সুর আবৃত্তি নয়। তার থেকে গভীর কিছু। একই গান একই সুরে তিনজন গাইলে তিনরকম লাগে কেন? আসলে প্রত্যেকের মধ্যেই নিজস্ব কিছু ব্যাপার থাকে। সহজভাবে গাইলে তা বোঝা যায়। আবার কাউকে অনুকরণ বা অনুসরণের চেষ্টা করলে বিভ্রাট বাধে। নিজস্বতা হারিয়ে যায়। গানের সুর-তাল-লয় অনুশীলনের সময় কথাগুলো ঠিকমতো ভাব অনুযায়ী উচ্চারণ করলে গানের গভীরে পৌঁছোনো যাবে। তখন আনন্দ মিলবে দুজনেরই, যে গাইবে তার। এবং যে শুনবে তারও। নবীন গায়কদের বারবার গানের কথা পড়ে নিতে হবে। রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে তো অবশ্যই।

বইমিত্র

প্রশ্নবাণ

১. নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তছনছ করে কে? কোন্ সময়ে? ধ্বংস হয় কতদিন ধরে?

২. কলকাতা বইমেলার মাঠে আগুন লাগে কোন্ সালে কত তারিখে? তখন মেলা কোন্ মাঠে হোত?

৩. গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুর যাঁর স্মৃতিকথার বইয়ে ছবি আঁকেন তাঁর নাম? সম্পর্কে কে? স্মৃতিগ্রন্থের নাম?

৪. কলকাতার কোন এলাকায় রয়েছে তিনটে সরকারি স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, বইপাড়া?

৫. বুড়ো আংলা, হযবরল, চাঁদের পাহাড়, হলদে পাখির পালক, কোনি— এসব বইয়ের লেখকের নাম?

উত্তর ১. বখতিয়ার খিলজি। ১১৯৩ খৃস্টাব্দে। তিনমাস লাগে পুড়তে। ২. ৩ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭। কলকাতা ময়দান। ৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কাকা। জীবনস্মৃতি। ৪. কলেজস্ট্রিট। ৫. অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুকুমার রায়, বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, মতি নন্দী।

ছবিতে ভুল খোঁজা

উল্টো পাল্টা

রাজু চটপট উত্তর দেয় বলে তাকে অনেকে ভালোবাসে। আবার অপছন্দও করে অনেকে। সেদিন দিবাকর-স্যার বললেন, ‘তোমাকে দশটা কমলালেবু দিলাম।’ রাজু বলল, ‘দেননি। ধরে নিলাম দিয়েছেন।’ দিবাকর বললেন, ‘দশদিন বাদে আরও পাঁচটা দিলাম।’ রাজু বলল, ‘তারপর কটা দেবেন?’ দিবাকর বললেন, ‘তাহলে কটা রইল তোমার কাছে?’ রাজু বলল, ‘একটাও নয়। কারণ এতদিনে লেবু পচে যাবেই।’

২

বামাচরণ খুব ভক্তিমান। বছরে একবার গুরুদেব আসেন শিষ্যের বাড়িতে। এলে থেকে যান কদিন। কদিন মানে বেশ কদিন। গুরুর অন্য শিষ্যরা তেমন পয়সাওয়ালা নয়। বামাচরণের গুরুভক্তি আর পয়সা দুই-ই আছে। কিন্তু গুরু-বোঝা কতদিন টানা যায়! শিষ্য একদিন গুরুকে জিগ্যেস করল, ‘গুরুদেব, আপনার ছেলে-মেয়েদের কথা মনে পড়ে না?’ গুরু বললেন, ‘পড়ে বইকি। কিন্তু বাড়ি যেতে মন চাইছে না। তোমার গুরুসেবা দেখে তাদেরও এখানে আসার জন্য চিঠি লিখেছি।’ বামাচরণ একেবারে চুপ।

রামগরুড় সংকলিত

নতুন আলোয় নয়, অন্ধকারে আজও নারী সমাজ

ইন্দিরা রায়

নতুন বছরে সমাজের বিভিন্ন দিক আলোকিত হলেও মহিলামহলে কোনও নতুন আলো পড়েনি। 'জীর্ণ পুরাতন যাক্ ভেসে যাক'—বলার মতো নয় নারী সমাজ— কারণ, চিরাচরিত কাল ধরে নারীর ওপর শোষণ, নিপীড়ন, শারীরিক অত্যাচার চলছে অব্যাহত। ইদানিংকালে একটা নতুন সংযোজন ঘটেছে— সেটা হলো রাস্তাঘাটে; বাসে ট্রেনে,জনারণ্যে চলছে ধর্ষণ। শিশু থেকে পরিণত কেউই বাদ যাচ্ছে না। এর জন্য কোনও শীর্ষস্থানীয় নেতা সরব নন, তাদের মতে— না, এত ধর্ষণ তো ঘটছে না, সব সাজানো। কারোর মতে, মেয়েদের অশালীন দৃষ্টিকটু পোশাকের জন্যই পুরুষ প্রলোভিত হচ্ছে। কারোর আবার অভিমত, যাদের ওপর ধর্ষণ হচ্ছে, তাদের সে সময়ের গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান ভাল নয়। তাই ঘটছে। আবার কেউ-বা বলেন, ভারতে ঘটছে না, ইন্ডিয়াতে ঘটছে। বিভিন্নজনের বিভিন্ন মতামত যে কোনও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে হোক না কেন, মূলত নারীর শালীনতা মর্যাদা ভূ-লুণ্ঠিত হচ্ছে, এটা তো নিঃসন্দেহে সত্য। সমাজে নারীর স্থান যদি এইভাবে বিচার্য হয়; তাহলে সেই দেশের উন্নতি নৈব নৈব চ।

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের দেড়শো বছর পালিত হচ্ছে মহাসাড়ম্বরে দেশের দিকে দিকে। কিন্তু যদি তাঁর মুখনিঃসৃত বাণী যথাযথ অনুধাবন না করা যায়, তাহলে এই মিথ্যাচার কেন! স্বামীজী বলেছেন— যে দেশে নারীর মর্যাদা নেই, সে দেশের উন্নতি নেই। একটি পাখি একটা ডানায় ভর করে উড়তে পারে না; দুটি ডানার সাহায্য প্রয়োজন। ঠিক তেমনি একটি দেশের বা রাষ্ট্রের উন্নতি সম্ভব পুরুষ ও নারী উভয়ের মিলিত প্রচেষ্টায়। কিন্তু আজকের দিনের ছবিটা আলাদা। পুরুষের নারীকে চাই শুধুমাত্র ভোগ্য পণ্য হিসেবে, অন্য কিছু নয়। অথচ অন্ধ এই পুরুষগণ ভেবে দেখে না, যে মাটিতে তার জন্ম তিনিই মা। যাঁর গর্ভে জন্মে পৃথিবীর আলো দেখল তিনি একজন মহিলা। এইরকম দিশাহীন ভয়ঙ্কর নীচ মানসিকতার মধ্যে থেকে যখন হতাশায় জর্জরিত, তখন হঠাৎই এক আশার বাণী শোনা গেল কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষ থেকে। সেটি হলো এই যে, বর্তমান বছর অর্থাৎ ২০১৩-র ২৪ জানুয়ারি

'শিশুকন্যা দিবস' হিসেবে পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পশ্চিমবাংলার সরকারের কাছে চিঠি পৌঁছেছে এই কথা জানিয়ে যে যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে এই দিনটি পালন করা হোক। ২০১১ সালে জনগণনা অনুযায়ী শিশু কন্যার হার অনেক কমে গেছে। বিশেষ করে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে প্রায় ১৩ শতাংশ হারে শিশুকন্যার সংখ্যা কমেছে। এ রাজ্যে ১৮-২৩ জানুয়ারি পর্যন্ত জেলায় জেলায় শিশু কন্যার নিরাপত্তা সম্পর্কে সচেতনতা শিবিরের আয়োজন করা হবে। কিছু প্রকল্পও গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবারে কন্যাসন্তান জন্মালে তার নামে ৫০০০ টাকা ব্যাঙ্কে জমা রাখবে রাজ্য সরকার। ১৮ বছর বয়স হলে ওই টাকা নিতে পারবে তার অভিভাবকরা। তবে ওই শিশুকন্যাই ওই টাকার মালিক হবে। স্কুলে স্কুলে ক্যারাটে জুডো শেখানোর ব্যবস্থা হবে। কন্যাভ্রূণ হত্যারোধেই প্রকল্প চালু করার প্রস্তাব দিয়েছে নারী ও সমাজকল্যাণ দপ্তর। সমাজে নারীদের নিরাপত্তা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশ কিছু প্রভাব দিয়েছে এই কমিশনের সদস্যরা।

কিন্তু একটা প্রশ্ন থেকেই যায়, সরকার যে সব প্রকল্পের কথা বলেছে আজকের শিশুকন্যা তথা ভবিষ্যতের নারীদের উদ্দেশে যে আলোকবর্তিকা তুলে ধরল, সত্যিই কি তা কার্যকর হবে! তবে হ্যাঁ, এত অত্যাচার নির্যাতন দৈহিক পাশবিক ক্ষত সহ্য করেও দেখা যাচ্ছে যে, মেয়েরাই নিজেরা ঘুরে দাঁড়াচ্ছে এবং তাদের নিরাপত্তা তারাই দিচ্ছে। বিদেশে অর্থাৎ পাকিস্তানের তালিবানদের ফতোয়ার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়ে স্কুল পড়ুয়া কিশোরী মালালা গুলিবিদ্ধ হওয়ার জন্যই সে আজ সারাবিশ্বে এক অসাধারণ দুঃসাহসিক নির্ভীক মহিলা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ১৬ ডিসেম্বর দিল্লীর বাসে গণধর্ষণে ক্ষত বিক্ষত ধর্ষিতা মেয়েটি মৃত্যুর আগে পর্যন্ত শরীরের অসহ্য কষ্টে বাক্যহারা হয়েও লিখে জানায়— নরাধমদের অবিলম্বে শাস্তি দিতে হবে। সেই প্রতিবাদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে শুধু দিল্লীতে নয়, সারা ভারতে প্রতিবাদের মিছিল উত্তাল হয়ে উঠেছিল। মোমবাতি নিয়ে মিছিল করা হলো ঠিকই; কিন্তু সত্যিই কি এসব দুষ্কর্মের মূলোচ্ছেদ হবে কোনওদিন? সমাজে নারীর মর্যাদা সম্যকভাবে প্রতিষ্ঠিত হবে কোনওদিন বলে মনে তো হয় না। না হলে কেন্দ্রীয় সরকারের পক্ষে 'আইন কঠোর করা,' 'বিচারের প্রক্রিয়া দ্রুত করা' ইত্যাদি আশ্বাস আজও কেন কার্যকর হচ্ছে না? মহিলা কমিশনের পক্ষ থেকে নারী নিরাপত্তা যৌন হেনস্থা কার্য বিষয়ে নানা প্রস্তাব পাঠানো সত্ত্বেও সরকার নিশ্চুপ, নিশ্চল। জাতীয় ক্রাইম ব্যুরোর অপরাধের পরিসংখ্যানে দেখা যাচ্ছে, ১৯৭১-এ যেখানে দেশে নথিভুক্ত ধর্ষণের সংখ্যা ছিল ২ হাজার ৪৮৭টা, ৪০ বছর বাদে ১৯১১-এ সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৪ হাজার ২০৬টা। বিভিন্ন ধরনের অপরাধের মধ্যে নারীর হেনস্থাজনিত অপরাধের সংখ্যা বেশি। তবুও প্রশাসনের কোনও হেলদোল নেই। ঢিলেঢালা ভাব। নারী নির্যাতন বাংলার তথা সমগ্র নারীজাতির পক্ষে কলঙ্কজনক। তার প্রতিকার তো সরকার অর্থাৎ জনগণের শাসকই তো করবে। আজ আমরা কোন্ রাজ্যে বাস করছি! এদিকে শিশু কন্যার হার কম বলে চিন্তিত সবাই। যাক্ না মুছে নারী; তাহলে অবশ্য পৌরুষত্ব-এর প্রমাণ হবে কী করে! এটা ঠিক যে, নারী-পুরুষের সমমর্যাদা সম-অধিকার না থাকলে যতই বড় বড় উন্নয়নমূলক বার্তা পৌঁছে দেওয়া হোক না কেন, তা কোনওদিনই বাস্তবায়িত হবে না।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনষ্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

নেত্রদান মহাদান

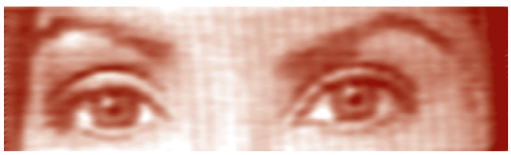

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

PIONEER®

নিখুঁত লেখার খাতা

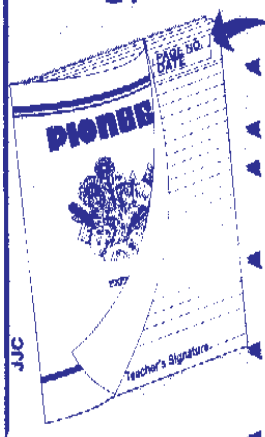

- প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
- পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
- আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
- ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
- প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
- ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
- প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature.................... কলাম।

PIONEER PAPER CO.
Off: 4a, Jackson Lane (1st floor)
Kolkata-1. Ph:350-4152, 353-0556
Fax:91-33-353-2596.
E-Mail:pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

ভাইব্রান্ট গুজরাট

স্বপ্নিল জীবনের সন্ধানে

অতিথি কলম

স্বপন দাশগুপ্ত

গত সপ্তাহে 'ভাইব্রান্ট গুজরাট' বা দোলালাগানো গুজরাট শীর্ষ সম্মেলন চাক্ষুষ করলাম। আমি অবাক হলাম এই দেখে যে, ওই সম্মেলনে কলকাতা থেকে বিভিন্ন মিডিয়ার বহু লোকজন এসেছেন। পরে জানলাম মিডিয়া তাদের লোকজনদের নির্দেশ দিয়েছে ওই সম্মেলনটি ঠিকমতো কভার করতে। সম্ভবত তাদের লক্ষ্য হলো হলদিয়ায় আসন্ন লগ্নিকারীদের সম্মেলনে মমতা ব্যানার্জীকে বার্তা দেওয়া। লক্ষ্য যাই থাক আমি রোমাঞ্চিত হলাম এই ভেবে যে, ভারতের সবচেয়ে দ্রুততম উন্নয়নপরায়ণ এবং বাণিজ্যসুহৃদ রাজ্য গুজরাট যা দেশের কাছে এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ স্বরূপ। সম্ভবত গুজরাটের এই সাফল্য থেকে পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষা নেবে।

দিল্লী ফিরে আমি এই বিষয়টা আমার এক বন্ধুকে যিনি জাতীয় এক সংবাদপত্রের সম্পাদকীয় বিভাগের বরিষ্ঠ আধিকারিক, তাঁকে বললাম। তিনি বিষয়টা তুড়ি মেরে বললেন, 'আচ্ছা, বাংলার বিষয়টা এই কাগজে তেমনভাবে উল্লিখিত হয়নি।' কৌতুক স্বরে তিনি বললেন, দ্বি-বার্ষিক এই সম্মেলনের একমাত্র তুলনা চলে এশিয়ার ডাভোসে যে দুনিয়ার শীর্ষসম্মেলন হয়েছিল তার সঙ্গে, কেবল এখানে শীর্ষবিশ্বনেতারা অনুপস্থিত আর খানা-পিনার আয়োজন অতটা জাঁকজমক নয়। ২০০২ সালের পর থেকে গুজরাটের এই সাফল্যকে আমার বাম, প্রগতিবাদী বন্ধুরা খাটো করে দেখে এসেছেন বা অবজ্ঞা করে এসেছেন। ২০০৭ সাল পর্যন্ত এঁরা ভেবেছিলেন রাজনীতিতে একাকিত্ব, বিচারবিভাগের অতিসক্রিয়তা আর কূটনৈতিক ক্ষেত্রে একেবারেই একঘরে নরেন্দ্র মোদী বুঝি বা উন্নয়নের মানচিত্র থেকে টিকটিকির মতো খসে পড়বেন।

বিভিন্ন মহল চেষ্টা চালাচ্ছিল গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধী পক্ষকে উৎসাহিত করে বিভিন্ন সময়ে মুখ্যমন্ত্রীকে অপদস্থ করার। প্রায় প্রতিটি মোদী বিরোধীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে কমিটি পদ পাইয়ে দিয়ে, কিংবা পদ্ম শিরোপা দিয়ে নয়তো রাজ্যসভার সদস্য বানিয়ে অথবা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত করে। সেই সঙ্গে যাঁরা মোদীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাঁদের নিজ নিজ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়াও হয়েছে। রাজীব গান্ধী ইনস্টিটিউট অব কন্টেম্পোরারি স্টাডিজের প্রাক্তন অধিকর্তাকে সরিয়ে দেওয়া হলো কেবল ২০০৫ সালে এক রিপোর্টে গুজরাটকে দেশের এক নম্বর আর্থিকভাবে উন্নত রাজ্য বলে অভিহিত করায়। মজার ব্যাপার হলো তার পর থেকে দীর্ঘ সাতটি বছর গুজরাটের আর্থিক স্বাধীনতার অবস্থান একেবারের জন্যও টলেনি।

আর্থিক উন্নয়নের ফল্গুধারা আজও অব্যাহত এবং আরও স্পষ্টতর। আজকের অনিল আম্বানির মোদীর সম্পর্কে যে অতিশয়োক্তি তা অবশ্যই ২০০৭ সালের রতন টাটার অভিব্যক্তি 'যে শিল্পপতি গুজরাটে তার শিল্প স্থাপন করবে না সে বা তারা নির্বোধ', উক্তির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। ভারতের শিল্পমহল একসঙ্গে গুজরাটকেই বুড়ো আঙ্গুল (অভিনন্দন জ্ঞাপন অর্থে ব্যবহৃত) দেখিয়েছে। এইজন্যই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মোদীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করুন। ঠিক চার বছর আগে যুযুধান দুই রাজনৈতিক দলের বিবাদের ফলে বিতাড়িত টাটা ন্যানো গাড়ির কারখানা স্থাপন করার পরই সেখানে গড়ে উঠেছে অটোমোবাইল হাব। সারাদেশ আর কখনওই এমন সুন্দর সাফল্য আগে প্রত্যক্ষ করেনি।

অর্থনীতির ভাষায় গুজরাট এগিয়ে চলেছে অবিরাম। তাই তো জগদীশ ভাগবতী অথবা লর্ড মেঘনাদ দেশাইয়ের মতো ব্যক্তিরা নির্ভয়ে গুজরাট মডেলের নিরন্তর জয়গান গেয়ে যান অথবা তাঁরা সমস্বরে বলে যান যে, ভারত তার আর্থিক ক্ষমতাকে পুরোদমে কাজে লাগাতে পারবে তখনই যখন তার পুরোভাগে থাকবে মোদীর মতো একজন নেতা। এমনকি আমেরিকা বা ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের গান্ধীনগরের ওপর আরোপিত প্রতিকূলতা খড়কুটোর মতো উড়ে গিয়েছে। 'ভাইব্রান্ট গুজরাট'-এ ব্যাপকহারে বৃটিশ সদস্যদের উপস্থিতি এবং গুজরাট সম্পর্কে বৃটিশ দূতের উচ্চকিত প্রশংসা যেন '১৮০' ডিগ্রি ঘুরে যাবার মতো অবস্থা সৃষ্টি করেছে। কানাডা থেকেও ব্যাপক হারে উপস্থিতি রয়েছে। অস্ট্রেলিয়রা নিয়ে এসেছেন তাঁদের দ্রুত উন্নয়নের নলেজ ইকনমির ডালি সাজিয়ে। জাপানীরা দিল্লী-মুম্বাই ১৪৮৩ কিলোমিটার দীর্ঘ যে ফ্রেট করিডরের ৩৮ শতাংশই গুজরাটের মধ্য দিয়ে গেছে তাতে প্রচুর লগ্নি করেছে এবং যা আগামী দশকের এক উজ্জ্বল উন্নয়নের দলিল।

বাস্তবিক, ধোলেরা অঞ্চলে বিশেষ

বিভিন্ন মহল চেষ্টা চালাচ্ছিল গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রীর বিরোধী পক্ষকে উৎসাহিত করে বিভিন্ন সময়ে মুখ্যমন্ত্রীকে অপদস্থ করার। প্রায় প্রতিটি মোদী বিরোধীকে পুরস্কৃত করা হয়েছে কমিটি পদ পাইয়ে দিয়ে, কিংবা পদ্ম শিরোপা দিয়ে নয়তো রাজ্যসভার সদস্য বানিয়ে অথবা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত করে। সেই সঙ্গে যাঁরা মোদীর প্রশংসায় পঞ্চমুখ তাঁদের নিজ নিজ পদ থেকে সরিয়ে দেওয়াও হয়েছে।

বিনিয়োগ সারাদেশে বহু আলোচিত এক প্রকল্প। শিল্পের চাহিদার সব উপকরণই এই প্রকল্পের অধীন। অমরচাঁদ মঙ্গলদাসের ম্যানেজিং পার্টনার শার্দুল শর্ফ তা সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থিত সদস্যদের কাছে উত্থাপন করেন। তিনি আমাকে বললেন যে, শিল্পবান্ধব সুযোগ-সুবিধা সারা দেশে এমনকী পশ্চিমবঙ্গেও প্রাপ্ত। তথাপি মোদী সরকার আইনের মাধ্যমেই তা করতে চান বলেই রাজ্য বিধানসভায় আইন পাশ করিয়ে নেন। এই আইন পাশ করতে হয়েছে কেবল কেন্দ্রের সঙ্গে রাজনৈতিক সংঘাত এড়াতে এবং আইনকে কঠোরভাবে পালন করে কেন্দ্রের পূর্ণ কোটার অর্থও আদায় করা হয়েছে।

পরিস্থিতি হলো গুজরাট ইতিমধ্যে শিল্প এবং টাউনশিপ গড়তে এক লপ্তে বড় জমি নিয়ে 'ল্যান্ড ব্যাঙ্ক' গড়েছে যা গুজরাটকে উন্নয়নে স্বাভাবিক দিশা দেখাচ্ছে। কিন্তু কম ফলনশীল জমি স্বেচ্ছায় সরকারকে দিয়ে রাজ্যের উন্নয়নে নিজেদের সামিল করেছে গুজরাটবাসীরাও নিজ নিজ পরম্পরাগত পেশাকে বিসর্জন দিয়ে।

সমকালীন গুজরাটে সবচেয়ে সুনিশ্চিত বিষয় হলো শহর বা গ্রামবাসীরা নয়া গুজরাট গড়ে আরও সুবিধা লাভের জন্য, আরও সুন্দর জীবন গড়ে তুলতে সরকারকে খোলা হাতে সহায়তা দিতে এগিয়ে এসেছে। হাজার হাজার সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ সেমিনারে যোগদান করেছে শহরে তামাশার জন্য নয়। কেউ কেউ সেখানে এসেছেন তাঁদের ব্যবসায়ী উদ্যোগকে আরও ফলপ্রসূ করতে এবং কেউ কেউ উপস্থিত সেখানে নতুন উদ্যোগ কীভাবে করতে হবে তার ধ্যান-ধারণা লাভের জন্য। বিদেশীরা এখানে এসেছে কেবল বিনিয়োগের জন্য নয় বরং তারা এদেশের মানুষদের আহ্বান জানিয়েছে তাদের দেশে বিনিয়োগ করতে। রাজনীতির ব্যাখ্যায় গুজরাট হলো আত্মিকভাবে জাতীয়তাবাদী, (কেউ কেউ একে বিদেশীদের প্রতি বিদ্বেষ বলেও থাকবেন) কিন্তু বাণিজ্যের ব্যাপারে গুজরাট একবাক্যে দুনিয়ার সম্পদ।

সম্প্রতি এক নিবন্ধে কানাডিয়ান অর্থনীতিবিদ বিবেক দেহেজিয়া লিখেছেন, গুজরাটের উন্মুক্ত বাজারের তত্ত্বে কেন সরকার বা মোদী পূজা? উত্তর স্পষ্ট : ভাইব্রান্ট গুজরাটের খাত সমাজে গভীরভাবে গ্রোথিত।

গুজরাটের উন্নয়নের রথের চাকা এক সারথির নিয়ন্ত্রণে। গুজরাট আজ যা পেয়েছে তা মোদীর একার স্থিরপ্রজ্ঞার ফসল। মোদী নিন্দুকদের সবরকম সমালোচনা উপেক্ষা করেই এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আর্থিক উন্নয়নের। মোদীর অসম্ভব উদ্যম এবং যোগ্য ব্যক্তিদের যথাস্থানে নিয়োগই এই অভাবিত সাফল্যের চাবিকাঠি। পর পর তৃতীয়বার নির্বাচনী উত্তরণের পর মোদীর ওপর আলোচনায় বিষয়বস্তু বদলে গেছে। তাঁর বিরোধীরা আজকাল বলতে শুরু করেছে যে, গুজরাট মডেল কি ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শে দীক্ষিত শাসকগোষ্ঠী ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে প্রয়োগ করবেন? এর উত্তর মোদী-ই দিন। যাই হোক, সম্প্রতি মোদী আলোচনায় আমাকে বললেন, গুজরাটে কেবল বন্দর রয়েছে— রাজ্যের কোনও ইস্পাতের জন্য আকরিক নেই, বিদ্যুতের জন্য নেই কয়লা। মনে করুন, তিনি বললেন, 'অসমের মতো যদি প্রাকৃতিক সম্পদ থাকতো আমাদের, কিংবা ঝাড়খন্ড এবং পশ্চিমবঙ্গের মতো, আমি তাহলে ভারতের চেহারাটাই বদলে দিতাম।'

দেশের জন্য আমার আশা তিনি যেন সে সুযোগ পান।

(লেখক একজন স্বনামধন্য বরিষ্ঠ সাংবাদিক)

এলাহাবাদ পূর্ণকুম্ভের জন্য প্রকাশিত হল

প্রয়াগ পূর্ণকুম্ভ

— লাল ঠাকুর

—: প্রাপ্তিস্থান :—

ঘোষ এন্ড চক্রবর্তী

(পাবলিশার্স এন্ড বুক সেলারস্)

১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতাঃ৭০০ ০৭৩

ফোন - ৯৭৪৯৪৩৮৪৮৮

শিক্ষার মানের অবনমন : দায়ী রাজনৈতিক নেতৃত্ব

তারক সাহা

বেশ কয়েক বছর ধরে এদেশের শিক্ষার মানের ক্রমাবনতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে। সর্বশিক্ষা অভিযান নিয়ে সরকার খুব ঢাক-ঢোল পেটাচ্ছে। এ নিয়ে রাজ্যে রাজ্যে ভোট কেনার অভিযানও জারি, অথচ স্কুল পড়ুয়াদের মানের অবনমন যে শুরু হয়েছে, তার শেষ কোথায় কেউ তা জানে না। 'প্রথম' নামে এক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (এন জি ও) সারা দেশে এক সমীক্ষা চালিয়েছে এবং তারা যে শিক্ষাগত মানের ছবি এঁকেছে তা অত্যন্ত উদ্বেগজনক। তিন বছর হলো সরকার শিক্ষার অধিকার যার পোশাকি ইংরেজি নাম হলো রাইট টু এডুকেশন (আর টি ই) দেশব্যাপী শুরু করলেও কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তারা বলছে প্রাথমিক স্তরে সরকার পরিকাঠামোয় ব্যাপক লগ্নী করলেও প্রাথমিক শিক্ষাস্তরের শিক্ষার মান গত তিন বছরের তুলনায় অনেক নেমে গেছে।

এই স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাটি ২০০৬ সাল থেকে প্রতি বছর শিক্ষার গুণগত মান নিয়ে সমীক্ষা চালিয়ে আসছে। সদ্যসমাপ্ত বছরটিতে (২০১২) তারা সারা দেশে ৫৬৭ জেলায় ১৪,৫৯১টি বিদ্যালয়ে ৫.৯৬ লক্ষ শিশুদের উপর এক সমীক্ষা চালিয়েছে যার মধ্যে ৯০ শতাংশ বিদ্যালয়-ই হলো সরকার পরিচালিত। প্রায় ২৫ হাজার সমীক্ষক সমীক্ষা চালিয়ে পড়ুয়াদের অবস্থান কী তারই এক পরিসংখ্যান তারা পেশ করেছে। এগুলি হলো :

(ক) ২০১০ সালে দেশের প্রায় ৪৬ শতাংশ পঞ্চম শ্রেণীর পড়ুয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাষা শিক্ষার বই পড়ায় অকৃতকার্য হয়েছে। এই সংখ্যা

উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১১ সালে এই শতাংশের হার ৫২ শতাংশের মতো, ২০১২-তে ৫৩ শতাংশের বেশি। সবচেয়ে খারাপ পরিস্থিতি হলো হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও কেরলে।

(খ) ২০১০ সালে তৃতীয় শ্রেণীর পড়ুয়ারা যারা প্রথম শ্রেণীর ভাষা শিক্ষার বই পড়তে অকৃতকার্য হয়েছে তাদের শতকরা হার ৫৪.৪ শতাংশ, ২০১১-তে এই শতাংশের হার ছিল ৬০ শতাংশের মতো আর ২০১২ সালে এই হার দাঁড়িয়েছে ৬১.৩ শতাংশে।

(গ) পঞ্চম শ্রেণীর পড়ুয়ারা সাধারণ ভাগ করতে পারে না। তাদের শতকরা হার হলো ৬৪ শতাংশ (২০১০), ৭২.৪ শতাংশ (২০১১) এবং ৭৫.২ শতাংশ (২০১২)।

(ঘ) ২০১০ সালে পঞ্চম শ্রেণীর পড়ুয়াদের ২৯ শতাংশ পড়ুয়া সাধারণ পাটীগণিতের দুই অঙ্কের বিয়োগ সঠিকভাবে করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই হার বৃদ্ধি ২০১১ ও ২০১২ সালে যথাক্রমে ৩৯ ও ৪৬.৫ শতাংশ। পাটীগণিত শিক্ষার ক্ষেত্রে অন্ধ্র, কেরল ও কর্ণাটকের পরিস্থিতি একটু ভাল হলেও বাকি রাজ্যগুলির হাল অত্যন্ত খারাপ।

এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের বক্তব্য হলো যে, সর্বশিক্ষার বিষয়টা শুনতে ভাল হলেও এর বিষময় পরিণতির জন্য দায়ী অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলে দিয়ে সব পড়ুয়াদের উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তীর্ণ করে দেওয়াটা। এইসব শিক্ষার অবক্ষয়ের মূলে রয়েছে আমাদের দেশের রাজনৈতিক নেতাদের অযাচিত অভিভাবকত্ব। তৎকালীন দেশের মানব সম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক মন্ত্রী কপিল সিবাল কেন্দ্রীয় বোর্ড সি বি এস ই পরিচালিত বিদ্যালয়গুলিতে দশম শ্রেণী পর্যন্ত পরীক্ষা ব্যবস্থা তুলে দিয়ে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলেন। আমাদের দেশের মুশকিল হলো মন্ত্রীরা বিশেষজ্ঞদের সুপারিশে কর্ণপাত করাকে বিশেষ প্রয়োজনীয় বলে মনেই করেন না। সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গে এরকমই ঘটনা ঘটেছে। অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল উঠিয়ে দিলেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। বিশেষজ্ঞদের অভিমতকে থোড়াই কেয়ার করে। ফলস্বরূপ বিশেষজ্ঞদের

চ্যানেল থেকে শিক্ষাবিদ সুনন্দ সান্যাল পদত্যাগ করলেন। এরকমটা ঘটেছিল বামফ্রন্ট আমলেও। 'মাতৃভাষাই মাতৃদুগ্ধ' স্লোগান তুলে প্রাথমিকে ইংরেজি শিক্ষাটাই তুলে দিলেন। এখন সেই মাতৃভাষায় মাতৃদুগ্ধ পোষ্যরা গত ৩৪ বছরে বিস্তর জ্ঞানলাভ করেও স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় অকৃতকার্য হচ্ছে। সরকারি বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ ছাত্র-ছাত্রীরা বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষক-শিক্ষিকা নির্বাচনের ক্ষেত্রে পেরে উঠছে না। এমনটাই ঘটেছে সি বি এস ই পরিচালিত স্কুল সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায়। সেখানে মাত্র ১ শতাংশ কৃতকার্য, বাকি ৯৯ শতাংশই অকৃতকার্য। এইসব শিক্ষক-শিক্ষিকা যদি বিদ্যালয়গুলিতে পড়াবার জন্য নির্বাচিত হন তবে আগামী প্রজন্মের ভবিতব্যের ক্ষেত্রে একমাত্র ভগবানই ভরসা।

এই সর্বশিক্ষা আইনে স্পষ্ট বলা আছে বিদ্যালয়গুলিতে পড়ুয়াদের লেখা-পড়ায় কতটা অগ্রসর হলো তার মূল্যায়ন করার কথা। কিন্তু যদি অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাশ-ফেল তুলেই দেওয়া হয় তবে মূল্যায়নটা হবে কিসের ভিত্তিতে? বিশেষজ্ঞদের মতে সরকার পরিচালিত বিদ্যালয়গুলির শিক্ষক-শিক্ষিকারা অপেক্ষা করতে থাকেন সরকারি নির্দেশের অপেক্ষায়। এতে বিলম্ব ঘটে শিক্ষাদান প্রক্রিয়ায়। এই বিদ্যালয়গুলিতে অনেক সচেতন শিক্ষক-শিক্ষিকা আছেন যাঁরা চান পড়ুয়ারা সঠিকভাবে পাঠাভ্যাস করুক। কিন্তু সরকারি শাস্তির খাঁড়ার ভয়ে এঁরা তাঁদের দায়িত্ব সঠিকভাবে পালন করতে পারেন না।

'প্রথম' এডুকেশন ফাউন্ডেশনের কর্ণধার মাধব চ্যবন এই বিষয়ে মন্তব্য করেছেন যে, বিদ্যালয়গুলিতে পাঠ্যসূচী শেষ করার দিকে নজর না দিয়ে বরং বিদ্যালয়গুলি আইনের বাধ্য-বাধ্যকতার গেরোয় আটকে থাকে। 'প্রথমে'র এই হতোদ্যম ফলাফল দেখে হতবাক আমাদের মানব সম্পদের নতুন মন্ত্রী এম এস পাল্লাম রাজু।

সর্বশিক্ষা আইনে গুণসমৃদ্ধ শিক্ষা প্রদানের কথা বলা হলেও গত তিন বছরে কাজের কাজ হয়নি, যা শেষ হচ্ছে এ বছরের মার্চের ৩১ তারিখে। সরকার বারবার দেশের ১৩ লক্ষ সরকারি বিদ্যালয়ের পরিকাঠামোর ব্যবস্থা যেমন ক্লাসরুম, ছাত্রীদের জন্য পৃথক শৌচাগার, পানীয় জলের ব্যবস্থা, গ্রন্থাগার, খেলার মাঠ, সীমানা ঘেরা দেয়ালের নির্মাণের কথা বলেছে, কিন্তু তা কার্যকর হয়েছে মাত্র ৫০ শতাংশ। সবচেয়ে সঙ্গীন পরিস্থিতি হলো শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগের ক্ষেত্রে। যোগ্য মানের শিক্ষক-শিক্ষিকা পাওয়াই যাচ্ছে না।

'ফিসচুলা, পাইলস্ থেকে বিনা রক্তপাতে চিরমুক্তি'

পায়ুদ্বারের ভেতরে বা বাইরের নানা শিরা উপশিরায় জ্বালাময়, যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতিই হলো পাইলস্।

পায়ুদ্বারের পাশে হওয়া গর্ত থেকে পুঁজ, গ্যাস, রক্ত বা বায়ু ইত্যাদি নির্গত হলে তা হলো ফিসচুলা। এই সমস্ত রোগে রোগীরা এর ওর কথায় টোটকা ব্যবহার করেন। তাতে যন্ত্রণা বেড়েই চলে। ডাক্তারের কাছে গেলে উপদেশ দেন অপারেশনের। পুনঃ পুনঃ অপারেশনেও সারে না। কখনও কখনও সৃষ্টি হয় নতুন সমস্যা, অথচ আমাদের আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা পদ্ধতি বিনা অপারেশনে যন্ত্রণাহীন চিকিৎসার পথ খুঁজে পেয়েছে অনেককাল আগেই। আয়ুর্বেদে ক্ষারসূত্র ও কেমিক্যাল কর্টারির সুনিপুন মিশ্রণে **জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার** তৈরি করেছে এক অভিনব চিকিৎসা পদ্ধতি। যার সফলতম প্রয়োগে পাইলস এবং ফিসচুলার যন্ত্রণাহীন কার্যকরী চিকিৎসা করা সম্ভব। এই জাতীয় চিকিৎসায় নামমাত্র কাটা ছেঁড়ার প্রয়োজন হয়। তাই রোগী চিকিৎসার পর পায়ে হেঁটে বাড়ী ফিরতে পারেন।

না এটা কোন হাতুড়ে অস্ত্রোপচার নয়, বিগত দশ বছর ধরে যে পদ্ধতিতে এখানে শত শত রোগী চিরতরে সুস্থ হয়েছেন সেই পদ্ধতি জাপানে তোয়ামা মেডিক্যাল কলেজ এবং নেপালে ত্রিভুবন ইউনিভার্সিটির চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের দ্বারা পরীক্ষিত এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা (WHO) স্বীকৃত দিল্লীর AIIMS ও চণ্ডীগড়ের P.G.I. তেও এই পদ্ধতি অনুসরণ করা হচ্ছে।

কি কি চিকিৎসা হয় এই পদ্ধতিতে?

প্রোলাপ্স পাইলস্, ফিসচুলা, ব্লিডিং পাইলস, পাইলোনিডাল সাইনাস, রেক্টোভ্যাজাইনাল ফিসচুলা, ফিসার সবকিছুরই চিরতরে মুক্তি ঘটে।

জীবক আয়ুর্বেদিক স্পেশালিটি সেন্টার

হাকিমপাড়া, হরেন মুখার্জী রোড, G.T.S. ক্লাবের নিকটে জর্জ ইনস্টিটিউট বিল্ডিং, শিলিগুড়ি

ডাঃ এস কর, মোবাইল নং-9434877734

—ঃ এখানে রোগীদের দেখার সময় ঃ—

সোমবার থেকে শুক্রবার ঃ সকাল ১০টা থেকে দুপুর ১২.৩০টা পর্যন্ত এবং বিকেল ৫ টা থেকে ৮টা পর্যন্ত।
ও শনিবার ঃ বিকেল ৫ টা থেকে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত।

বালুরঘাট সীমান্তে বি এস এফ-কে হুমকি পাচারকারীদের

অজয় সরকার : বালুরঘাট॥ টহলরত বি এস এফ জওয়ানদের মিথ্যা মামলায় ফাঁসিয়ে দেওয়ার হুমকিকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল বি এস এফ মহলে। বি এস এফের পক্ষ থেকে সম্প্রতি বালুরঘাট থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। বি এস এফ সূত্রে জানা গিয়েছে, অতি সম্প্রতি সীমান্ত এলাকায় প্রহরারত অবস্থায় পাচারকারীরা তাদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির মামলা ঠুকে দেবে বলে হুমকি দিচ্ছে। বি এস এফের অভিযোগ, গ্রামে পাচার হওয়ার জন্য অনেক সময়ই গোরু মজুত থাকে। সেগুলির তল্লাশি চালানোর সময় গ্রামে ঢুকতেই হয়। কিন্তু গ্রামে ঢুকবার পর যদি এধরনের হুমকি আসে তাহলে কাজ চালানোয় সমস্যা হবে।

বি এস এফের ৭৫নং ব্যাটেলিয়নের অ্যাসিস্ট্যান্ট কমান্ডান্ট রাম কুমার বলেন, ১২ জানুয়ারি শনিবার সন্ধ্যা সাতটার সময় পাহারা দেওয়ারত অবস্থায় পাচারকারীদের কাঁটাতারের সংলগ্ন এলাকা থেকে চলে যেতে বলে। সেই সময় চোরাকারবারীরা বলে বি এস এফ যদি তাদের সহায়তা না করে তবে তাদের ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি মিথ্যা কেসে ফাঁসিয়ে দেবে। ডাঙ্গি বি ও পি'র ৭ কিলোমিটারের প্রায় তিন কিলোমিটার এলাকায় কোনও তারকাঁটা বেড়া না থাকার কারণে এই এলাকায় পাচারকারীদের খুব বেশি বাড়বাড়ন্ত। পাচার কাজে বাধা পেয়েই তারা এসব করছে।

ভাটপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান লগিন দাস বলেন, বি এস এফের পক্ষ থেকে আগে পঞ্চায়েত বা গ্রামবাসীদের সঙ্গে মাসে একবার করে মিটিং করা হোত। কিন্তু গত এক বছর থেকে তা বন্ধ। ফলে গ্রামবাসীদের সঙ্গে বি এস এফের দূরত্ব অনেক বেড়ে গিয়েছে। তাছাড়া বি এস এফ পাচারের বিরুদ্ধে বললেও বি এস এফের এক অংশই পাচার কার্যের সঙ্গে যুক্ত। তবে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানি কেসে বি এস এফকে ফাঁসানোর ব্যাপারটির তিনি নিন্দা করেন।

দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপার প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, বি এস এফের পক্ষ থেকে একটি অভিযোগ পেয়েছি। তবে তাদের বিরুদ্ধে ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির কেসের ব্যাপারটি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

সম্প্রতি কাশ্মীরে ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে ভারতীয় জওয়ানের মুণ্ডুহীন দেহ নিয়ে দুই দেশের কূটনৈতিক মহলে ব্যাপক চাঞ্চল্য শুরু হয়েছে। ভারত সরকার সীমান্তে জওয়ানদের নিরাপত্তা নিয়েও বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়ার কথা চিন্তা করছে। এই সময় ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বি এস এফের বিরুদ্ধে পাচারকারীদের হুমকির ঘটনা প্রকাশ্যে আসতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। চলতি মাসের প্রথম দিকে হিলির গোসাইপুর এলাকায় বি এস এফ অভিযান চালাতে গিয়ে প্রবল বিক্ষোভের মুখে পড়ে। তার জেরেই হিলির লস্করপুর এলাকায় বি এস এফের ওপর আক্রমণ করে পাচারকারীরা। পাচারকারীদের লক্ষ্য করে বি এস এফ গুলি চালালে এক জন গ্রামবাসীর মৃত্যু হয় ও আরও দুজনকে হাসপাতালে ভর্তি করতে হয়। তথ্যাভিজ্ঞ মহলের ধারণা, বি এস এফের ওপর যদি এ ধরনের মিথ্যা মামলা দেওয়া হয় তবে তা দেশের পক্ষে ক্ষতিকারক হবে।

মালদায় একের পর এক মন্দিরে চুরি

তরুণ পণ্ডিত।। গত ২০ থেকে ২৩ জানুয়ারি--- ৪ দিনে মালদা জেলার ইংলিশবাজার শহরে ১১টি মন্দিরে চুরির ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। চোরেদের দৌরাত্ম্য থেকে রক্ষা পায়নি মাকালী, মা শীতলা, রাম, মনসা ও রাধাকৃষ্ণের মন্দিরগুলিও। গত ১৯ জানুয়ারি শনিবার একদিনে শহরের ৫টি মন্দিরে চোরেরা হানা দেয়। ১৯ তারিখ শনিবার চুরি হয় রাজ্যের নারী ও কল্যাণমন্ত্রী সাবিত্রী মিত্রের বাড়ির ঠিক সামনের কালী মন্দিরে। বিগ্রহের মাথার মুকুট, গলার মালা সহ লক্ষাধিক টাকার সামগ্রী নিয়ে গেছে। অভিযোগ দুষ্কৃতিরা মন্দিরগুলির দরজার তালা ভেঙে যেমন অলঙ্কার নিয়ে গেছে তেমনি রাধাকৃষ্ণের বিগ্রহও চুরি করেছে। গত ২২ তারিখ আবার ৪টি মন্দিরে চুরি হয়। রাজ্য পর্যটনমন্ত্রী কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরীর অফিসের লাগোয়া কালীতলা বুড়িকালী মন্দির থেকে ওইদিন লক্ষাধিক টাকার অলঙ্কার চুরি হয়। একই কায়দায় চুরি হয়েছে সোনা, রূপার গহনা সহ রাধাকৃষ্ণের একটি পিতলের বিগ্রহও দক্ষিণ বালুচর কালী মন্দির থেকে। পর পর মন্দিরে চুরির ঘটনায় শহর জুড়ে আলোড়ন পড়েছে। পুলিশ তদন্ত শুরু করলেও প্রশ্ন উঠেছে মন্ত্রীদের অফিস ও বাড়ির সামনে থেকে হিন্দুদের দেবীর অলঙ্কার ও বিগ্রহ চুরি হয়ে গেলে সাধারণ মানুষের বাড়ি কতটা নিরাপদ? পুলিশের টহলদারি নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। যদিও বলা হয়েছে উপনির্বাচনের আগে শহরের পরিবেশকে উত্তেজনাকর পরিস্থিতি তৈরি করতেই এই চুরির ঘটনা কোন চক্র করছে। কিন্তু পুলিশি তদন্তে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত দুজন দুষ্কৃতি ও কিছু অলঙ্কার উদ্ধার হলেও এতগুলি মন্দিরের গহনা উদ্ধার হয়নি।

জাতীয়তাবাদী বাংলা সংবাদ সাপ্তাহিক

পড়ুন ও পড়ান

স্বস্তিকা

প্রতি সংখ্যা মূল্য ৭.০০ টাকা

বার্ষিক সডাক গ্রাহকমূল্য ৩২৫ টাকা

বাণিজ্যনগরীর কুলফির কারিগর

অন্য রকম

নিজস্ব প্রতিনিধি।। নিয়মিতভাবে চলছে স্কুল, ছাত্রদের কোলাহলে মুখরিত তার অঙ্গন। গৃহস্থালির কাজ সেরে মহিলারা ঠিক সময় পৌঁছে গেছেন তাঁদের পশু খামারে। সবকিছুই স্বাভাবিক, কিন্তু চোখে পড়বে না বাড়ির কর্তা এমন কোনও পুরুষ মানুষকে। প্রতি বছর মার্চের প্রথম দিকে এমনই পরিবেশ দেখতে পাওয়া যায় পুণে থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরের গ্রাম ওয়াধানেতে। মার্চ থেকে জুলাইয়ের মাঝামাঝি এই সময় সেখানকার পুরুষ মানুষেরা অধিকাংশই থাকেন মুম্বাইতে। কুলফি তৈরি ও বিক্রি করে সংগ্রহ করেন সারা বছরের আয়ের কিছু অর্থ।

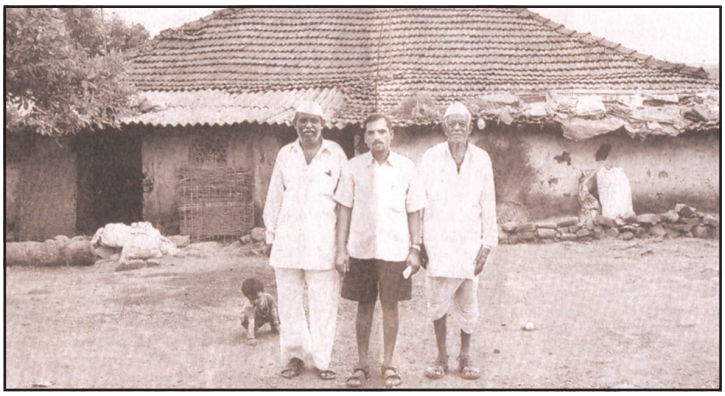

মার্চ থেকে জুলাই, ওয়াধানের অধিকাংশ মানুষকে দেখা যায় মুম্বইতে কুলফি তৈরি ও বিক্রি করতে।

ওয়াধানের শান্তারাম দিনকার বোডকে (৩৪), পনেরো বছর ধরে মুম্বইতে কুলফি বিক্রি করছেন। জানিয়েছেন— 'এটা আমাদের পারিবারিক ব্যবসার একটা অংশ। কুলফি তৈরি আমি শিখেছি বাবার কাছে, তিনি শিখেছেন ঠাকুর্দার কাছে, বংশ পরম্পরায় এভাবেই চলে এসেছে।' বর্তমানে ওয়াধানের জনসংখ্যা খুব বেশি হলে পাঁচশো। স্কুল, পোস্টঅফিস, গ্রাম পঞ্চায়েত সবই আছে। কিন্তু পেশার টানে কিছুদিনের জন্য তাঁরা গিয়ে বাস করছেন মুম্বইতে। দশ থেকে বারো জন মিলে একটি ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতে হয়। একটি ঘরেই শোয়া ও রান্না দুটোই। অনেক সময় ওই ঘরেই চলে কুলফি তৈরির কাজ। তখন অবস্থা খুবই দুর্বিষহ হয়ে ওঠে বলে জানিয়েছেন দামাজী নামদেও বোডকে; যিনি এক সময় কুলফি বানাতেন। বয়সের কারণে এখন ছেড়ে দিয়েছেন। গ্রীষ্মকালে নিজের পরিবার পরিজন ছেড়ে, কষ্টের মধ্যেও এভাবেই বাণিজ্যনগরীতে তাঁরা দিয়ে চলেছেন কুলফির জোগান। গরমে যখন চাহিদা বেড়ে যায় তখন হয়তো একটু হাসি ফোটে ওঁদের মুখে। শহরে প্রত্যেক ফেরিওয়ালার নির্দিষ্ট সীমা আছে। লাল কাপড়ের ট্রেডমার্ক দেওয়া পাত্র নিয়ে সেখানেই তাঁরা বিক্রি করেন কুলফি।

বৃদ্ধ দামাজীকে অনুরোধ করতেই তিনি বললেন, তাঁদের কুলফি তৈরির পদ্ধতি। মোষের দুধ দিয়ে তৈরি করা হয় এই কুলফি। প্রথমে দুধ ফুটিয়ে একটি পাত্রে রাখা হয় ঠাণ্ডা হওয়ার জন্য। তারপর বেশ কিছুক্ষণ ধরে নাড়ানোর পর মুখ বন্ধ করে রাখা হয়। সেখান থেকে লবণ ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস মিশিয়ে এক বিশেষ পদ্ধতিতে ঠাণ্ডা করে ছাঁচে ফেলা হয়। কিন্তু সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদাও পাল্টে যায়। তাই সেটা মাথায় রেখে চকোলেট, আম, স্ট্রবেরির মতো বিভিন্ন সুগন্ধি মেশানো হয়। সুগন্ধি এই কুলফিগুলি তাঁরা বিক্রি করেন পাঁচ থেকে পঁচিশ টাকার মধ্যে। সুগন্ধ ও আকারের উপর তা নির্ভর করে।

শুধু ওয়াধানের নয় তার আশেপাশের অনেক গ্রামই এই পেশার সঙ্গে যুক্ত। কিন্তু সময় বদলেছে, নতুন প্রজন্ম আর তেমনভাবে এই কাজে উৎসাহী নয়। তারা স্কুল কলেজে পড়ছে, ভাল চাকরি করছে। তাই গ্রামের দীর্ঘদিনের এই ঐতিহ্যবাহী পেশা আর কতদিন টিকে থাকবে তা নিশ্চিত নয়।

প্রয়াগ পূর্ণকুম্ভ শিবির

পুণ্যস্নান—১৩ জানুয়ারি,
২৭ জানুয়ারি,১০ ফেব্রুয়ারি,
১৫ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

৫ দিন থাকা-খাওয়া ১০০০ টাকা ও ২০০০ টাকা।
ট্রেনের টিকিট নিজেরা কাটবেন।
স্পেশাল ট্রেনের ব্যবস্থা আছে।

—ঃ ঠিকানা ঃ—

রামকৃষ্ণ আশ্রম,
৬৭, ধর্মতলা স্ট্রীট, কালকাতা-১৩
ফোন : ২২৬৫-৬৭০৪, ৯৪৭৭৯৪৩৪৯৭

জীবনের প্রতি পদে
থাকে যদি ডাটা
জমে যায় রান্নাটা
DUTA
Turmeric Powder
Chilli Powder
Coriander Powder
Cumin Powder
Black Pepper powder
ডাটা
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুকমী) প্রাঃ লিঃ

পাঠচক্রের উদ্যোগে আয়োজিত বিবেকানন্দ মিলন-মেলা

সংবাদদাতা।। কলকাতায় স্বামীজীর পৈতৃক আবাস সিমলা পাড়ায় স্বামীজীর সার্ধ জন্মশতবর্ষ উপলক্ষে আয়োজিত হলো বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা, প্রায় হাজার পাঁচেক ছাত্র-ছাত্রীদের পদযাত্রা, ৬ দিন ব্যাপী (২২-২৭ জানুয়ারি) স্বামী বিবেকানন্দ মিলন মেলা। নাচগান-আবৃত্তি, নাটক, মার্গ সঙ্গীত, বৌদ্ধিক চর্চা, শারীরিক কসরত থেকে বই-পত্র, পোষাক থেকে পাটিসাপটা পর্যন্ত সমস্ত অনুষঙ্গে ভরপুর ছিল এই মিলন মেলা। স্বামীজী-নেতাজীর পদরজধন্য কালিসিংহী পার্ক ও সিমলা ব্যায়াম সমিতি প্রাঙ্গনে রামকৃষ্ণ মিশন স্বামী বিবেকানন্দ পৈতৃক আবাস ও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র তত্ত্বাবধানে বিবেকানন্দ পাঠচক্র স্বামী বিবেকানন্দ মিলন মেলা আয়োজন করে। সিমলে পাড়ায় ৪২ বছর ধরে স্বামীজীর নামে দৈনন্দিন সেবাকার্যেরত বিবেকানন্দ পাঠচক্রের সদস্য-সদস্যারা।

বিবেকানন্দ পাঠচক্রের এত দিন ব্যাপী নিঃস্বার্থ সেবা ও স্বামীজীর পৈতৃক আবাস পুনরুদ্ধারে স্থানীয় সহযোগিতার স্বীকৃতি পাওয়া গেল মিলন মেলার উদ্বোধক এবং রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সাধারণ সম্পাদক পূজ্যপাদ স্বামী সুহিতানন্দ মহারাজের কণ্ঠে। পুরানো দিনের কথার অবতারণা করে তিনি বললেন, স্বামীজীর বাড়ির পুনরুদ্ধার এবং বর্তমান অবস্থায় আসতে প্রচুর বাধা-বিপত্তি আসে। মঠ ও মিশনের বিরুদ্ধে ৫১টি মামলা রুজু করা হয়। পুলিশও জানায় দীর্ঘকাল দিবা-রাত্রি তারা সুরক্ষা দিতে অপারগ যদি না স্থানীয় শক্তি পাশে না এসে দাঁড়ায়। পার্থ মহারাজের আহ্বানে বিবেকানন্দ পাঠচক্র তাঁদের পাশে হাজির হয়। সেখানে একটি এ্যাসবেসটসের ঘরে ৫০/৬০ জন যুবকের 'ভারতে বিবেকানন্দ' পাঠ চলতে লাগল। ক্রমে ক্রমে সব বাধা দূর হলো। নির্বিঘ্নে হলো ভূমি পূজন। বহুপূর্বেই পাঠচক্রের উদ্যোগে সাহিত্যিক, বিচারপতি, উপাচার্য, শিক্ষাবিদ, সাংবাদিক প্রমুখ বিশিষ্ট নাগরিকবৃন্দের

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, তুষার মজুমদার, স্বামী সুহিতানন্দ ও স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ।

স্বাক্ষরিত প্রায় ৫,০০০ জনের আবেদন রাজ্যপালের নিকট প্রদত্ত হয়েছিল। বিশেষ এক গোষ্ঠী অপপ্রচার শুরু করে যে মঠ ও মিশন জোর করে স্থানীয় আবাসিকদের উচ্ছেদ করছে। এই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে বিবেকানন্দ পাঠচক্র প্রকৃত ঘটনা প্রচার করে যে, একজনও আবাসিককে ক্ষতিপূরণ ছাড়া উচ্ছেদ করা হয়নি। প্রায় দেড় কোটি টাকা মিশন ব্যয় করে। বাড়ি, ফ্ল্যাট বা অর্থ সাহায্য দিয়ে আবাসিকদের ক্ষতিপূরণ করা হয়।

২২ জানুয়ারি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের সভাপতিত্ব করেন স্বামীজীর পৈতৃক আবাসের সম্পাদক স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, প্রধান অতিথি ছিলেন বিশিষ্ট সাহিত্যিক শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের আসরে পণ্ডিত বুদ্ধদেব দাশগুপ্তকে অভিনন্দিত করা হয়। তিনি সরোদ বাজিয়ে শ্রোতাদের মুগ্ধ করেন। পরে কণ্ঠসঙ্গীতে ছিলেন রাজ্যশ্রী ঘোষ।

২৩ জানুয়ারি সকালে যুব সম্মেলনে যায়, ছাত্র-ছাত্রীর সামনে ভাষণ দেন স্বামী জ্ঞানলোকানন্দ (সম্পাদক, বরানগর রামকৃষ্ণ মিশন আশ্রম), স্বামী ত্যাগীবরানন্দ (বেলুড় মঠ), ডঃ সোমনাথ ভট্টাচার্য (রিডার, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়)। সভাপতিত্ব করেন অনুপ গুপ্ত, পরিচালনা করেন সুব্রত সাহা। সভার শেষাংশে স্বামীজীর উপর ক্যুইজ হয়।

সন্ধ্যায় প্রধান অতিথি ডঃ শিবাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য, প্রধান বক্তা স্বামী ঋতানন্দ (সম্পাদক, উদ্বোধন), সভাপতি তুষার কান্তি মজুমদার (সভাপতি) বিবেকানন্দ পাঠচক্র। শারীরিক ক্রিয়া কৌশল প্রদর্শন করে সিমলা ব্যায়াম সমিতি এবং সোস্যাল আর্টিস্ট সোসাইটি।

২৪ জানুয়ারি ভাষণ দেন স্বামী দিব্যানন্দ (সম্পাদক, সারদা পীঠ), স্বামী শিবময়ানন্দ (বেলুড় মঠ)। সভাপতিত্ব করেন বিকাশ ভট্টাচার্য। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সঙ্গীতে ছিলেন কল্যাণ চট্টোপাধ্যায়, গৌড়ীয় নৃত্যে ডঃ মহুয়া মুখোপাধ্যায়। নাটক পরিবেশন করে বিবেকানন্দ ইয়ুথ ফোরাম।

২৫ জানুয়ারি প্রধান বক্তা স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ, প্রধান অতিথি হরিপ্রসাদ কানোড়িয়া, সভাপতি কর্নেল সব্যসাচী বাগচী। উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে সরোদ বাজান ত্রৈলী দত্ত, সেতার বাজান সুপ্রতীক সেনগুপ্ত।

২৬ জানুয়ারি সকালে স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের 'বসে আঁকো প্রতিযোগিতা'। সন্ধ্যার অনুষ্ঠানে প্রধান বক্তা ছিলেন স্বামী অনিরুদ্ধানন্দ (বেলুড় মঠ), সভাপতিত্ব করেন শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। সঙ্গীতে সুশান্ত দত্ত। যোগ নাটক 'বিবেকানন্দ'

ফঃ ৫

পরিবেশিত হয়। পরিচালনা বিশ্বনাথ দত্ত।

২৭ জানুয়ারি সকালে বৌদ্ধিক আলোচনা সভায় ছিলেন স্বামী ত্যাগরূপানন্দ (অধ্যক্ষ, বেলুড় বিদ্যামন্দির), অধ্যক্ষ অমল কুমার মুখোপাধ্যায় এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ডঃ সুদক্ষিণা গুপ্ত। বিষয়— 'স্বামীজী ও বর্তমান যুবসমাজ'। অনুষ্ঠানটি '২৪ ঘণ্টা'য় সরাসরি সম্প্রচারিত হয়।

সন্ধ্যায় প্রধান বক্তা ছিলেন প্রব্রাজিকা অমলপ্রাণা (সাধারণ সম্পাদিকা, রামকৃষ্ণ সারদা মিশন), বিশেষ অতিথি ছিলেন স্মিতা বক্সি, এম এল এ এবং নীলাঞ্জনা রায় (সাধারণ সম্পাদিকা, সংস্কার ভারতী, পশ্চিমবঙ্গ)। সভাপতিত্ব করেন অধ্যাপিকা রাইকমল দাশগুপ্ত। নৃত্য-পরিবেশন করেন ন্যাশনাল কয়ারের শ্রীমতী রাজরূপা দেব এবং অনন্যা কুণ্ডু। নাটক পরিবেশন করে রাজারহাটের 'প্রত্যয়'। পরিচালনা তাপস রায়।

স্বামী বিবেকানন্দের ভাবান্দোলনে যুক্ত বিভিন্ন সংগঠনকে এক মঞ্চে নিয়ে আসার উদ্যোগে বিবেকানন্দ পাঠচক্র যাঁদেরকে কাছে পেয়েছে এবং এই অনুষ্ঠানসূচীকে সফল করতে পেরেছে তাদের মধ্যে রয়েছে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন পরিচালিত বিভিন্ন সংস্থা, সংস্কার ভারতীর উত্তর ও দক্ষিণ কলকাতা শাখা, কলকাতার বিভিন্ন স্কুল, শ্রীবেদমাতা গায়ত্রী ট্রাস্ট, বিভিন্ন ক্লাব ইত্যাদি।

মঞ্চ পরিচালনা এবং অনুষ্ঠান পরিচালনায় যুক্ত ছিলেন বিবেকানন্দ পাঠচক্রের ভরত কুণ্ডু, সুদীপ দত্ত, ডাঃ তপন পাল, ডাঃ জয়দেব কুণ্ডু, পঙ্কজ ঘোষ, শঙ্কর বাগ, গৌতম কুণ্ডু, অরুণেন্দু দত্ত, বাণীব্রত নাথ খান, অঞ্জন কুণ্ডু, প্রসূন সেনগুপ্ত, ঋত্বিক কুণ্ডু, প্রবীর পাল, পূর্ণিমা দত্ত এবং শতাধিক সদস্য-সদস্যা।

স্বামী পূর্ণাত্মানন্দ তাঁর ভাষণে বেদান্তের ভাবধারা প্রচারে স্বামীজীর প্রচেষ্টা প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে বাংলাদেশের ঢাকায় আয়োজিত বিভিন্ন ধর্মাচার্যের মিলিত এক সভার কথা বলেন। সেখানে বৌদ্ধ ও খৃস্টমতের আচার্যেরা প্রায় সর্বক্ষণই ইসলামের গুণগান করে গেলেন, এমনই এক আতঙ্কের পরিবেশের মধ্যে ছিল ধর্মসভা। ভারত থেকে আগত এক মুসলিম বক্তা কিন্তু নিঃসংকোচে বলে এলেন শ্রীরামকৃষ্ণের প্রদর্শিত পথের কথা, বৈদান্তিক ধর্মের কথা, যে ধর্মকথা ইসলাম বা খৃস্ট মতের পরেও টিকে থাকবে তার বেদান্তের আলোক বিকিরণের মাধ্যমে।

সংস্কৃতভারতীর প্রথম ব্যাকরণ বর্গ

'সংস্কৃতভারতী'র প্রচেষ্টায় হুগলি জেলার গুপ্তিপাড়ায় দুর্গাবাড়িতে সংস্কৃতভারতীর কার্যকর্তাদের জন্য এই প্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণ বর্গ অনুষ্ঠিত হলো। জানুয়ারি মাসের ২৩ থেকে ২৭ তারিখ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত এই ব্যাকরণ বর্গে সংস্কৃত পত্রিকা 'সম্ভাষণ সন্দেশ'-এর সম্পাদক তথা বিশিষ্ট ব্যাকরণবিদ জনার্দন হেগড়ে এই বর্গে উপস্থিত ছিলেন। তাঁর কাছ থেকে পাণিনির সূত্র সম্বন্ধে বিষয়গুলি জেনে কার্যকর্তারা বিশেষভাবে উপকৃত। বর্গে মধ্যে মধ্যে বৌদ্ধিকের পাঠ দেন সংস্কৃতভারতীর সংগঠন সম্পাদক প্রণব নন্দ। বর্গের সমারোপ কার্যক্রমে উপস্থিত ছিলেন দুর্গাবাড়ির প্রধানা সরস্বতী দেবী ও সংস্কৃতভারতীর দক্ষিণবঙ্গের সম্পাদক পুরুষোত্তম ভট্টাচার্য।

পাঁচদিনের এই বর্গে পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন দক্ষিণবঙ্গের শিক্ষণ প্রমুখ স্বপন বিশ্বাস।

রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে শিল্পকলা প্রদর্শনী

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ চিত্রকর যামিনী রায়ের ১২৫তম জন্মবর্ষে তাঁকে উৎসর্গ করে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য নৃত্য নাটক সংগীত ও দৃশ্যকলা আকাদেমি ও রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক শিল্পকলা প্রদর্শনী ২৪ থেকে ৩০ জানুয়ারি আয়োজিত হলো।

উদীয়মান প্রতিভাদের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য আয়োজিত এই প্রদর্শনীতে নির্বাচিত ১৩৫টি ছবি স্থান পেয়েছিল। ঐতিহ্যবাহী শিল্পকলার মধ্যে পটচিত্রে প্রবীর মান্না, তপন চিত্রকর, ডোকরা— বুলু কর্মকার, মুখোশ— মাধব সরকার এবং নকশি কাঁথা— নিয়ামত শেখ এবং সমকালীন শিল্পকলার চিত্রাঙ্কনে (পেন্টিংস)— সন্তু সাহা, চিত্রাঙ্কন (ড্রয়িংস)— নারায়ণ কুমার দাশ, মহেশ্বর মণ্ডল, চারুকলা (গ্রাফিক্স)— জ্যোতির্ময় দলপতি, ভাস্কর্য— শরৎ রায় এবং মিক্সড মিডিয়া— সঞ্জু বসাক প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য।

রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির শীতকালীন বর্গ

গত ১৬ থেকে ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাষ্ট্র সেবিকা সমিতির দক্ষিণবঙ্গ সম্ভাগের কয়েকটি একদিনের অভ্যাসবর্গ অনুষ্ঠিত হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে মোট ছয়টি স্থানে এই বর্গগুলি চলে ও সর্বমোট ১৪১ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন বিষয়ে বৌদ্ধিক ও গীতসহ বেশকিছু শারীরিক কার্যক্রমের অনুশীলন হয়। এর মধ্যে উল্লেখ্য সূর্যনমস্কার, গণসমতা, যোগাসন ছাড়াও নানা ধরনের খেলার প্রশিক্ষণ।

স্থান ভেদে বর্গগুলির বিবরণ নিম্নরূপ :

(১) উত্তর ২৪ পরগণা (হাসনাবাদ) দিনাঙ্ক—১৬ ডিসেম্বর, শিক্ষার্থী সংখ্যা-২০, শিক্ষিকা-২ জন এবং কার্যকর্ত্রী-১ জন।

(২) দক্ষিণ ২৪ পরগণা (জয়নগর) দিনাঙ্ক—২১ ডিসেম্বর, শিক্ষার্থী-৩৫ জন, শিক্ষিকা-৩ জন, কার্যকর্ত্রী-১ জন।

(৩) দক্ষিণ ২৪ পরগণা (ঘটকপকুর) দিনাঙ্ক—২২ ডিসেম্বর, শিক্ষার্থী-২৬ জন, শিক্ষিকা-২ জন।

(৪) বেহালা, দিনাঙ্ক—২৩ ডিসেম্বর, শিক্ষার্থী-৪ জন, শিক্ষিকা-১ জন, কার্যকর্ত্রী-১ জন।

(৫) দক্ষিণ ২৪ পরগণা (কালীনগর) দিনাঙ্ক—২৪ ডিসেম্বর, শিক্ষার্থী-৪০ জন, শিক্ষিকা-২ জন। কার্যকর্ত্রী-২ জন।

(৬) হুগলী (নালিকুল) দিনাঙ্ক—২৫ ডিসেম্বর, শিক্ষিকা-২ জন। শিক্ষার্থী-১২ জন।

শতোত্তর রজতজয়ন্তীবর্ষে দ্বারহাট্টা রাজেশ্বরী ইনস্টিটিউশন্

হুগলী জেলার হরিপাল থানায় দ্বারহাট্টা রাজেশ্বরী ইনস্টিটিউশন্ আদর্শ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর মধ্যে অন্যতম। এই উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শতোত্তর রজতজয়ন্তী বর্ষ উদ্‌যাপন হলো মহাসমারোহে ২ থেকে ৪ জানুয়ারি। এই বিশেষ মুহূর্তকে চিরস্মরণীয় করার জন্য তিনদিন ব্যাপী সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এর উদ্বোধন করেন রাজ্যের কৃষি প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না। বস্তুত এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্থপতি তথা রূপকার ছিলেন রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত শিক্ষক ব্রহ্মচারী জ্যোতির্ময় চৈতন্য মহারাজ। যাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টা, অক্লান্ত পরিশ্রম, নিঃস্বার্থ আত্মত্যাগের মাধ্যমে গড়ে ওঠা এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এক ঐতিহাসিক মুহূর্তে উপনীত হতে সমর্থ হয়েছে তা অনস্বীকার্য। তাঁর স্মরণে 'জ্যোতির্ময়' মঞ্চের নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে তাঁর গুণমুগ্ধ প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে স্বাগত ভাষণ দেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক গোপাল চন্দ্র ঘোষ। এছাড়া তিনদিন ব্যাপী অনুষ্ঠানে নাচ, গান, নাটক, আবৃত্তি ছাড়াও বিজ্ঞান প্রদর্শনী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তবে বিপুল অর্থব্যয়ে আলোকসজ্জা প্রশংসনীয় হলেও জ্যোতির্ময়- চৈতন্য মহারাজের নিজ বাসভবনটি আলোকসজ্জিত করা হয়নি। যা অপ্রিয় হলেও সত্যি।

মঙ্গলনিধি

মালদা জেলা সম্পর্ক প্রমুখ শঙ্কর চৌধুরীর বিয়ে উপলক্ষে গত ২৫ জানুয়ারি বৌ-ভাতের দিন তাঁর দাদা হীরেন্দ্র মোহন চৌধুরী সমাজ সেবার জন্য ১০০১ টাকা মঙ্গলনিধি হিসাবে দান করেন। শঙ্কর চৌধুরীর বড়দা এই টাকা সঙ্ঘের ক্ষেত্র প্রচারক অদ্বৈত চরণ দত্তের হাতে তুলে দেন। উপস্থিতি ছিলেন উত্তরবঙ্গ প্রান্ত সহ-প্রচারক জলধর মাহাতো এবং বিভাগ কার্যবাহ তরুণ কুমার পণ্ডিত।

শোকসংবাদ

শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের শিক্ষক রোহিণী কুমার রায় পাটোয়ারী, গত ১০ জানুয়ারি পরলোকগমন করেছেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৫৫ বছর। তিনি শৈশবকাল থেকেই সংঘের স্বয়ংসেবক। আদত বাসিন্দা কোচবিহারের কুচলিবাড়ির। শিক্ষকতা পেশা ছাড়াও তিনি নানাবিধ সামাজিক উন্নয়ন কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। কুচলিবাড়ী সংগ্রাম কমিটির সঙ্গে যুক্ত থেকে তিনবিঘা আন্দোলন করেছিলেন। পঞ্চানন স্মারক সমিতির সঙ্গে যুক্ত থেকে সামাজিক উন্নয়নের কাজে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করেছেন। তিনি রেখে গেলেন পিতা, মাতা, স্ত্রী, ভাই, বোন আর তাঁর গুণমুগ্ধ ছাত্র ও বন্ধুদের।

***

প্রাক্তন বিভাগ সঙ্ঘচালক ও প্রচারক স্বর্গীয় অহীন্দ্র কুমার দে-এর দিদি জয়াবতী দে (৮৬) গত ২৪ জানুয়ারি মালদাতে পরলোকগমন করেন। তিনি সঙ্ঘের শুভাকাঙ্ক্ষী ছিলেন ও তাঁর বাড়িতে সকলের অবাধ যাতায়াত ছিল।

লেখকদের প্রতি

যে কোনওরকম লেখা, সে চিঠিপত্র, সংবাদ বা আলোচনা যাই পাঠান না কেন তা কাগজের একপিঠে পরিষ্কার হাতের লেখায় দু'দিকে যথেষ্ট মার্জিন রেখে না হলে কোন মতেই ছাপার জন্য বিবেচিত হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরত দেওয়া হয় না। কোনও লেখারই ফটো কপি গ্রাহ্য হবে না। ভারতীয় সংস্কৃতি ও মূল্যবোধের প্রতি অনুকূল লেখাই প্রকাশ করা হয়।

চিঠিপত্র বিভাগে লেখা পাঠালে খামের ওপর "চিঠিপত্র" কথাটি অবশ্যই লিখবেন। এতে খুব তাড়াতাড়ি চিঠিটি একেবারে চিঠিপত্র বিভাগে গিয়ে পৌঁছায়।

চিঠিপত্র বা সংবাদ সামগ্রী যাই পাঠানো হোক না কেন তাতে প্রেরকের পুরো নাম-ঠিকানা (পিন কোড সহ) এবং ফোন নম্বর থাকা দরকার। না থাকলে তা ছাপা হবে না

— সঃ স্বঃ

স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের দেড়শো বছর উপলক্ষে প্রকাশিত দুটি পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা

বিবেক ভারতী

প্রবুদ্ধ ভারত সংঘের ত্রৈমাসিক মুখপত্র 'বিবেক ভারতী' ৩৬ বছর ধরে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে এবং তা নির্দিষ্ট পাঠকমহলে সমাদর পাচ্ছে। প্রবুদ্ধ ভারত সংঘ একটি

সংকল্পবদ্ধ সংগঠন। যে উদ্দেশ্য ও কর্মপন্থায় এগিয়ে চলেছে সংস্থা তার মধ্যে মানব কল্যাণই প্রধান হয়ে উঠেছে। সংস্থা শ্রীরামকৃষ্ণ বিবেকানন্দ ভাবধারা প্রচারের সঙ্গে ত্যাগ ও সেবার আদর্শে অনুপ্রাণিত কর্মীদল গড়তে উদ্যোগী জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বিপন্ন মানুষের সেবার উদ্দেশ্যে। শিক্ষাবিস্তারে নিতে চায় সক্রিয় ভূমিকা। ধর্ম ও কর্ম মিলেমিশে রয়েছে সমস্ত উদ্যোগে। সেই সঙ্গে সংস্থার মুখপত্রে। আমাদের দপ্তরে এসেছে শারদ সংখ্যা 'বিবেকভারতী'। তার মধ্যে অনেকগুলি প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে বিভিন্ন বিষয়ে। প্রবন্ধগুলি আগ্রহী পাঠকদের নানাভাবে ঋদ্ধ করবে। প্রবন্ধের পাশাপাশি রয়েছে অনেকগুলি কবিতা। পত্রিকাটিতে ছাপার ভুল বেশ কিছু থাকলেও লেখাগুলির মধ্যে সত্য সুন্দর এবং বলিষ্ঠ ভাবনার পরিচয় রয়ে গেছে।

বিবেক ভারতী। সম্পাদক : বিমলচন্দ্র দে। প্রবুদ্ধ ভারত সংঘ, ইটাচুনা, হুগলি ৭১২ ১৪৭। দাম ২০ টাকা।

উত্তরণ

'উত্তরণ' পত্রিকার প্রকাশ ন'বছর ধরে। স্বামী বিবেকানন্দের জন্মের দেড়শো বছর উপলক্ষে বেরিয়েছে বিশেষ সংখ্যা। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে স্বামী বিবেকানন্দের জীবন ও কাজ নিয়ে আলোচনা করেছেন নামী অনামী প্রাবন্ধিকরা। সন্ন্যাসী হওয়ার পর তাঁর জীবনধারা বহু মানুষের হিতভাবনায় কীভাবে কেন্দ্রীভূত হয়েছে তা বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে লিখেছেন স্বামী শিবময়ানন্দ, স্বামী আত্মলোকানন্দ, স্বামী অনঘানন্দ, স্বামী কল্যাণেশানন্দ, শেখ মকবুল ইসলাম, দেবকুমার মিত্র, কুমারেশ চক্রবর্তী, এষা চট্টোপাধ্যায়, শিহরণ চক্রবর্তী প্রমুখ। বিবেকানন্দকে শ্রদ্ধা জানিয়ে লেখা কয়েকটি কবিতা ছাপা হয়েছে। শ্রদ্ধা জানানো হয়েছে পণ্ডিত রবিশঙ্কর, লেসলি ক্লডিয়াস এবং সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের উদ্দেশে। পত্রিকার মধ্যে ছোটোদের আঁকা ছবি ছাপা হয়েছে কয়েকটি। শ্রেণি শব্দটা ছাপা হয়েছে 'শ্রেনি'। বানানের সরলীকরণ চলছে। কিন্তু ভুল বেশি হলে মুশকিল। ভক্তি ও শ্রদ্ধার প্রকাশ যতই আবেগতাড়িত হোক মস্তিষ্ক ঠিক রেখে ধীরেসুস্থে সব কাজ না করলে ভুলচুক থেকে যাবেই। এই সংখ্যায় তা রয়েও গেছে। বলা

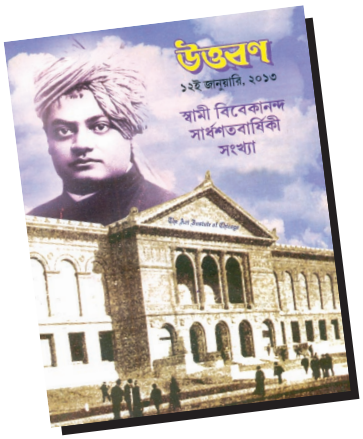

হয়েছে 'স্বামী বিবেকানন্দ সার্ধশতবার্ষিকী সংখ্যা' এটা যে তাঁর জন্মের সার্ধশতবর্ষ সেটা লিখিতভাবে বলা নেই। পাঠক ধরে নেবেন সব, আর ভুলচুক হলে মাফ করবেন— এ ধরনের মনোভাব কোনও কাগজের পক্ষেই শুভঙ্কর নয়।

উত্তরণ। সম্পাদক : ভাস্কর রায়। বিবেকানন্দ পল্লী, ডাক : উত্তর ২৪ পরগণা ৭৪৩ ২৪৮। ***কৌশিক গুহ***

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার করুন
মাত্র দুই মিনিটে ক্ষীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর
ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

সংস্কার ভারতীর শিশু-কিশোর নাট্যমেলা

বিকাশ ভট্টাচার্য

পাঠ্যপুস্তকের ভারে নুয়ে পড়া আমার-আপনার বাড়ির ছেলেমেয়েদের অন্যদিকে তাকানোর সুযোগ নেই বললেই চলে। আমাদের দেশের শিক্ষাব্যবস্থায় শিল্প-সংস্কৃতি বিষয়ে খুদে-পড়ুয়াদের সচেতন করে তোলার বিশেষ কোনও ব্যবস্থাও অপ্রতুল। অথচ, ছোটরা যখন বেড়ে ওঠে, সেই সময়েই সঙ্গীত, আবৃত্তি, নৃত্য ও অভিনয়ে তাদের আগ্রহ বা রুচিবোধ গড়ে না তুললে পরে আর হয়ে ওঠে না। আশার কথা, সংস্কার ভারতী শিশু-কিশোরদের নাচ, গান, আঁকাজোকা আর অভিনয় বিষয়ে বিশেষ আগ্রহী। চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা, নাচ ও গানের কর্মশালা ছাড়াও গরমের আর পুজোর ছুটিতে বিদ্যালয়ের ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের নিয়ে ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি কর্মশালাভিত্তিক প্রযোজনা করেছে। প্রতি বছর শিশু-কিশোর নাট্যমেলার আয়োজন করে বিভিন্ন বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের সুযোগ করে দেওয়া হয় তাদের অনুষ্ঠান মঞ্চস্থ করার।

এ বছর তৃতীয় শিশু-কিশোর নাট্যমেলা গত ২৭ জানুয়ারি ২০১৩ সকালে গিরিশ মঞ্চে অনুষ্ঠিত হলো। 'উদ্বোধন' কার্যালয়ের স্বামী ধর্মরূপানন্দ নাট্যমেলার উদ্বোধন করে বলেন, শিশুদের এ ধরনের উৎসব অনুষ্ঠানে সামিল করলে তাদের সৃজনশীলতা বাড়বে। সাধারণ সম্পাদিকা নীলাঞ্জনা রায় তাঁর স্বাগত ভাষণে জানান, এ বছর স্বামী বিবেকানন্দের সার্ধজন্মশতবর্ষে সংস্কার ভারতী আন্তঃবিদ্যালয় চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতার আয়োজন করে বেশ ভালো সাড়া পেয়েছে। মোট ২৭টি বিদ্যালয়ের ২০৪টি ছবি জমা পড়েছে। সবকটিই স্বামীজীর জীবনের নানা ঘটনা নিয়ে আঁকা।

নাট্যমেলার প্রথম নিবেদন বাগমারী-তেলেঙ্গাবাগান অঞ্চলের প্রাক-প্রাথমিক বিদ্যালয় দি হোলি একাডেমির 'বীরেশ্বর বিবেকানন্দ'। নাটক : চিরঞ্জিত ভদ্র। রেকর্ডে সংলাপের সঙ্গে পাঁচ অনূর্ধ্ব বয়সের শিশুরা হাত-মুখ নেড়ে তাদের নাটকটিকে উতরে দিয়েছে। দক্ষিণেশ্বর অঞ্চলের পথশিশুদের 'আনন্দ পাঠ্যশালা'র শিশুরা রবীন্দ্রনাথ, নজরুল থেকে অন্নদাশঙ্করের এক গুচ্ছ ছড়া 'ছড়ায় মোড়া আগাগোড়া' নিবেদন করে। সুকুমার রায়ের গল্প অবলম্বনে সান্ত্বনা চট্টোপাধ্যায়ের নাটক 'উকিলের বুদ্ধি' অভিনয় করে সংস্কার ভারতীর কচিকাঁচারা। দর্শকদের হাসি প্রমাণ করে নাটকটি তারা জমিয়ে দিয়েছে। পরপর তিনটি অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন যথাক্রমে সুপ্রীতি ভদ্র, প্রবীর ভট্টাচার্য ও প্রদীপ দাস। সবশেষে নিবেদন লেক গার্ডেনস্ প্রতিভার নৃত্যালেখ্য 'সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়'। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের নৃত্যগুরু নটরাজ বিষয়ক কবিতা- গান ও রচনার এই অনবদ্য কোলাজটি পরিচালনা করেন সংযুক্তা সেনগুপ্ত। অপূর্ব কোরিওগ্রাফি। সুন্দর উপস্থাপনা। রূপসজ্জা অনবদ্য। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গের নাট্য- সম্পাদিকা স্মিতশ্রী চট্টোপাধ্যায়।

সংস্কার ভারতী

দি হোলি একাডেমি

প্রতিভা

আনন্দ পাঠশালা

শব্দরূপ-৬৫৬ কৃষ্ণা গুপ্ত

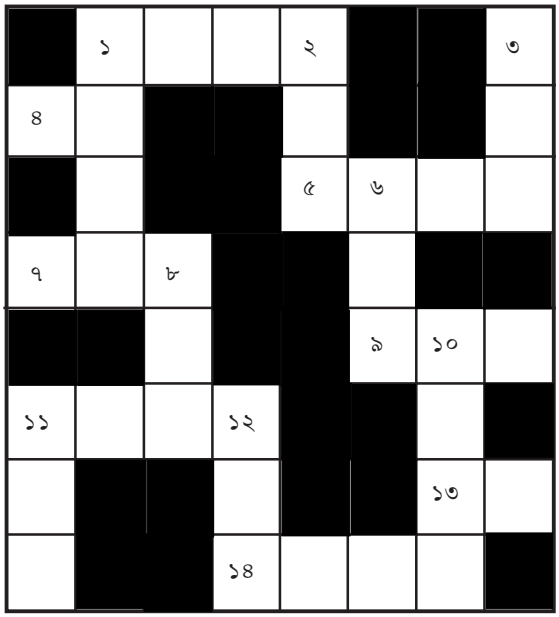

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. পূজ্য ব্যক্তির পা-ধোয়া জল, চরণামৃত, ৪. তৎসম জল, ৫. কাব্যলংকারবিশেষ, আগাগোড়া মাতুল, মধ্যে বিনাশ, ৭. পৃথিবীপৃষ্ঠ, পাতাল, ৯. বৈবস্বত মনুর এক পুত্র, প্রথম দুয়ে আকাশ, আগাগোড়া পর্বত, ১১. বিশ্বামিত্রের পিতামহ, প্রথম দুয়ে রামতনয়, ১৩. 'এক দেহে হলো—' পূরণীয় স্থানে লয়প্রাপ্ত, ১৪. ভরতের পুত্র তক্ষের নামানুসারে এই স্থানে রাজধানী স্থাপিত হয়, এখানে এখনও বহু বৌদ্ধ মন্দির আছে।

উপর-নীচ : ১. এই বৃক্ষ স্বর্গ ইন্দ্রের অমরাবতীর শোভা বর্ধনকারী, ২. চিনির তৈরি একধরনের মিঠাই বিশেষ, ৩. গন্ধর্বরাজ শৈলুষের কন্যা এবং রাবণ-সহোদর বিভীষণের পত্নী, ৬. ধুনোর মতো গন্ধযুক্ত বৃক্ষনির্যাস বিশেষ, শেষ দুয়ে বন্যা, ৮. চণ্ডীমঙ্গলের এক নারী চরিত্র, বণিক ধনপতির স্ত্রী, ১০. ইহজীবনের কার্যাবলী, জীবদ্দশা, ১১. ধনাধিপতি যক্ষরাজ, ১২. রামের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা।

সমাধান
শব্দরূপ-৬৫৩
সঠিক উত্তরদাতা
অভীক দাস
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

■	■	হা	বা	গো	বা	■	কী
আ	উ	ল	■	■	বা	■	চ
■	প	■	খ	■	জী	ব	ক
■	নি	কু	ঞ্জ	■	■	ল্লা	■
■	ষ	■	■	গো	কু	ল	■
উ	দ	ক	■	রা	■	সে	■
দ্ধ	■	দা	■	■	ক	ন	ক
ব	■	পি	তৃ	রি	ষ্টি	■	■

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

□ ৬৫৬ সংখ্যার সমাধান আগামী ৪ মার্চ, ২০১৩ সংখ্যায়

ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে

"চিকিৎসার জন্য দূরত্ব কোনও ব্যাপারই নয়, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো—ব্যধিমুক্তি"—রীণা দেবনাথ

সুদূর হুগলী জেলার কোন্নগরের এক গৃহবধূ—রীণা দেবনাথ। বছর ৪০-এর রীণা দেবী মারাত্মক চর্মরোগের শিকার হয়েছিলেন। খুবই কষ্ট পেতেন। সারা শরীর ফুলে ফুলে যেত, প্রচণ্ড চুলকাতো। রাতে ঘুমাতে পারতেন না। এভাবেই কষ্টের মধ্যে তাঁর দিন কাটছিল। হঠাৎ-ই রীণা দেবী তাঁর এক ঘনিষ্ঠ বান্ধবীর কাছে বিশিষ্ট হোমিও চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের নাম শুনলেন। জটিল এ্যালার্জী রোগী রীণা দেবী বিস্তারিত সব জেনে ২/১ দিনের মধ্যে চলে এলেন—হুগলীর কোন্নগর থেকে উত্তর ২৪ পরগণা মণ্ডলপাড়ায় ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে। রোগ যন্ত্রণায় বিব্রত ও দিশাহারা রীণা দেবনাথ হুগলী ও উত্তর ২৪ পরগণার দূরত্ব ভুলে গিয়েছিলেন। তাঁর কাছে মূল ব্যাপার ছিল রোগমুক্তি এবং এজন্য তিনি যে কোনও রকম কষ্ট স্বীকার করতে রাজী ছিলেন। যাই হোক—রীণা দেবী ডাঃ মন্ডলকে তাঁর রোগের সবিস্তৃত বর্ণনা দিলেন ও ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডল, অত্যন্ত ধৈর্যসহকারে সবকিছু শুনলেন এবং সেদিন থেকেই শুরু হলো—রীণা দেবীর চিকিৎসা। রীণা দেবীও আস্থা ও ধৈর্য নিয়ে ডাঃ তরুণ মন্ডলের কাছে চিকিৎসা করাতে লাগলেন। ধীরে ধীরে সুস্থ হবার দিকে এগোতে লাগলেন। সামান্য কয়েক মাসের চিকিৎসায় কোন্নগরের গৃহবধূ রীণা দেবনাথ আজ সুস্থ ও ভালো আছেন। দূর-দূরান্তে এমনও অনেক কঠিন ও জটিল রোগাক্রান্তরা আছেন যাঁরা মনে ভাবেন যে, ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের হোমিও চেম্বার অনেক দূরে কিন্তু কোন্নগরের রীণা দেবনাথ, এটা দেখিয়ে দিলেন যে, রোগ থেকে মুক্তি পেতে গেলে দূরত্বটা কখনই বড় ব্যাপার হতে পারে না।

রীণা দেবীর মাধ্যমে কোন্নগর ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রখ্যাত হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক ডাঃ তরুণ কুমার মন্ডলের একটা ব্যাপক প্রচার হয়েছে। এবং পরিচিত, অপরিচিত অনেকের কাছেই তিনি ডাঃ মন্ডলের অসাধারণ চিকিৎসা পদ্ধতির কথা বলেন ও ডাঃ তরুণ মন্ডলের প্রশংসায় পঞ্চমুখ আজ রীণা দেবী। *উপকৃত রোগী কর্তৃক প্রচারিত।*

যোগাযোগ ঃ হোমিওপ্যাথিক ট্রিটমেন্ট সেন্টার ফর ক্রনিক ডিজিস

ডাঃ তরুণ কুমার মণ্ডল—

B.H.M.S. (Cal.),FW.T., P.E.T."

কনসালট্যান্ট হোমিওপাথিক চিকিৎসক, অথরাইজড ডক্টর অফ নির্মল হেলথ ওয়েলফেয়ার সোসাইটি।

চেম্বার ঃ চাঁদপাড়া, উত্তর ২৪ পরগণা—
(সোম, শুক্র ও শনি সকাল ৮টা থেকে বেলা ১টা এবং প্রতিদিন বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা)।

বারাসত ঃ হৃদয়পুর, কলকাতা-১২৭—(মঙ্গল, বৃহস্পতি ও রবিবার—সকাল ১০টা থেকে বেলা ১টা)।

দেখানোর জন্য আগে নাম বুকিং করতে হবে।

মো ঃ ৯৩৭৮৩৮৫৬৬৬ / ৯৪৩৩৬৬০৯৩৬

।। চিত্রকথা।। মহাভারত।। ২৭

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

ব্রিটেন ছেড়ে ভারতীয় নাগরিকত্ব
ব্যতিক্রমী বিজ্ঞানী জে বি এস হ্যালডেন

নিকুঞ্জ বিহারী ঘোড়াই

ভারতবর্ষে আজ সন্ত্রাস হানাহানির বাড়বাড়ন্ত। ব্যক্তি স্বার্থ, দলের স্বার্থ, সাম্প্রদায়িক ভেদাভেদ সৃষ্টি করে ক্ষমতা দখলের মতলবে মানবতা লাঞ্ছিত, ভারতীয়ত্ব ভুলুণ্ঠিত। ভারতে জন্মে, ভারতের সুযোগ-সুবিধায় 'পুষ্ট' হয়ে অনেক ভারতবাসী পাকিস্তানের 'জয়' উৎসবের আনন্দে মেতে ওঠে। কিন্তু বৃটিশ বংশোদ্ভূত বিজ্ঞানী হ্যালডেনের ভারত-চিন্তা কী মহান ছিল তা আমাদের বিস্মিত করে। হ্যালডেন চিরতরে জন্মভূমি ত্যাগ করে ভারতবর্ষকে স্বদেশরূপে মনে-প্রাণে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি মনে-প্রাণে চাইতেন ভারতবর্ষে বিজ্ঞান গবেষণা জয়যুক্ত হোক।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার 'উপযুক্ত' 'সুযোগ-সুবিধা' নেই দেশে, তাই বিলেত-আমেরিকার 'তৈরি বাগানে' গবেষণার 'ফসল' ফলাতে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দেশত্যাগ ভারতবর্ষের পরাধীন আমল থেকে এখনও চলে আসছে। ভারতে বিজ্ঞানের সর্বোচ্চ ডিগ্রি লাভের পরে বিদেশে গিয়ে ওই দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে অনেক বিজ্ঞানী যথেষ্ট সুনাম অর্জন করেছেন, নোবেল পুরস্কারও লাভ করেছেন কেউ কেউ। নোবেল তালিকায় একশ' শতাংশ 'ভারতীয়' সুব্রহ্মনিয়াম চন্দ্রশেখর, হরগোবিন্দ খোরানা বা ভেঙ্কটরামন রামকৃষ্ণণ-এর নাম পরদেশি আমেরিকান হিসাবেই জ্বল জ্বল করছে। বাঙালির গর্ব বিজ্ঞানী মণি ভৌমিকও 'আমেরিকান'। এই তালিকার এক ব্যতিক্রমী ব্যক্তি হলেন খ্যাতনামা জীব-রসায়ন বিজ্ঞানী জন বার্ডন স্যান্ডারসন হ্যালডেন, সংক্ষেপে জে বি

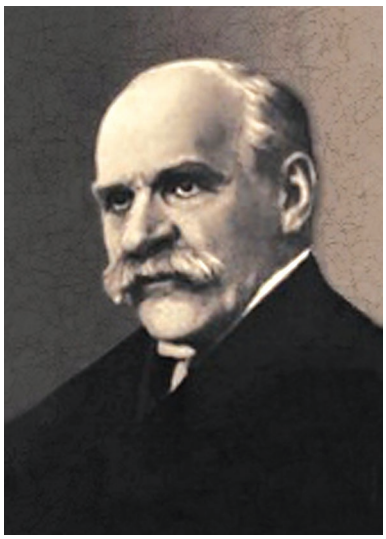

হ্যালডেন

এস হ্যালডেন নামে যিনি ভারতে ও বিশ্বে পরিচিত।

১৮৯২ সালের ৫ নভেম্বর অক্সফোর্ডে জন্ম হ্যালডেনের। পড়াশুনা অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ে। কেম্ব্রিজ এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রজনন বিদ্যা বা জেনেটিক্স বিভাগে অধ্যাপনা করেন হ্যালডেন। তিনি ছিলেন রয়াল সোসাইটির সদস্য। গণিত ও জীববিদ্যায় তাঁর ছিল অসাধারণ পাণ্ডিত্য। তিনি গাণিতিক নিয়ম কাজে লাগিয়ে ডারউইনের স্বাভাবিক ও কৃত্রিম নির্বাচনের তত্ত্বকে পরিপুষ্ট করেন এবং ডারউইনের তত্ত্বের যথার্থতা প্রমাণ করেন।

হ্যালডেনের বাবা ছিলেন শারীরবিদ্যার অধ্যাপক। গবেষণার কাজে তিনি বাবার 'গিনিপিগ' হয়ে যেতেন। সেই ধারা বজায় রেখে নিজেই নিজের শরীরে নানা জিনিস প্রয়োগ করেছেন, ফলাফল লক্ষ্য করেছেন। তিনি হিসেব করে দেখিয়েছেন, জলে কোনও এক সময় কিছু জটিল অণু জট পাকিয়ে পৃথিবীতে প্রাণের উদ্ভব হয়েছে। একই সময়ে বিজ্ঞানী এ আই ওপারিনও একই কথা বলায় আবিষ্কৃত হলো 'হ্যালডেন-ওপারিন' তত্ত্ব।

হ্যালডেন ১৯৫৭ সালে ভারতে তথা কলকাতায় এসে ১৯৬০ সালে ভারতীয় নাগরিকত্ব গ্রহণ করেন। কলকাতার ইন্ডিয়ান স্ট্যাটিসটিক্যাল ইনস্টিটিউটে অধ্যাপনা করেছেন তিনি। পরে ওড়িশায় নিজস্ব উদ্যোগে জেনেটিক্স অ্যান্ড বায়োমেট্রি গবেষণাগার স্থাপন করেন। তিনি ওই সংস্থার অধিকর্তা ছিলেন। তিনি এদেশে জেনেটিক্স ও জীব-রসায়ন বিভাগে অনেক কাজ করেছেন। জনপ্রিয় বিজ্ঞান বিষয়ে অনেক বই লিখেছেন। ভারতীয় তরুণ বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞান গবেষণায় উৎসাহ দিতে সারাদেশে অনেক বিজ্ঞান বিষয়ক বক্তৃতা দিয়েছেন। ভারতীয় হিসাবে তিনি ইংল্যান্ড ও আমেরিকায় অনেক পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন। ভারতবর্ষে আমৃত্যু তিনি ছিলেন বিজ্ঞান ও মানব কল্যাণে সমর্পিত।

পাজামা পাঞ্জাবি ও চপ্পল পায়ে বিজ্ঞানী হ্যালডেন ভারতীয় পরিবেশে গবেষণা করে কিছুসংখ্যক 'বিদেশমুখী' বিজ্ঞানীদের ঈর্ষার পাত্র হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি অনেক ভারতীয় বিজ্ঞানীকে এদেশে গবেষণা করতে উৎসাহী করেছিলেন, তাঁর নামে কলকাতায় রাস্তার নামকরণ করা হয়েছে। কলকাতার অন্যতম দ্রষ্টব্যস্থান 'সায়েন্স সিটি'-র ঠিকানা জেবিএস হ্যালডেন এভিনিউ। ১৯৬৪ সালের ১ ডিসেম্বর ভারতের মাটিতে তাঁর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পরেও তিনি নিজেকে 'গিনিপিগ' করে গেছেন— তাঁর ইচ্ছামতো তাঁর দেহকে চিকিৎসা বিজ্ঞানের কাজে লাগানো হয়েছে।

লেখক পদার্থ বিজ্ঞানের শিক্ষক

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/48/2013-2015
11 February - 2013

FOR INTERIORS THAT EVOKE ADMIRATION

For over two decades, Centuryply has been effortlessly redefining interiors into designer spaces with the most stunning range of products that reflect the very best of style, innovation and functionality.

CENTURYPLY
Quality that's a class apart!
Fortifying interiors with innovations like the first flexible ply, a 7 year termite-proof, pay back guarantee and many more…

CENTURYVENEERS
Exotic designs in wood!
Beautifying Interiors with an exclusive and wide range of Decorative veneers (only BWR available in India) & Senzura Styles, handpicked from around the world...

CENTURYLAMINATES
Style that stands out!
Trendsetting interiors with the widest range of laminates having myriad textures, stunning patterns and exquisite designs…

Also available:
CENTURYMDF
CENTURYPRELAM

CENTURYPLY®

দাম : ৭.০০ টাকা